সাতই নভেম্বর
যে দিন নতুন সূর্যোদয়

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা সম্পাদিত

সাতই নভেম্বর

যে দিন নতুন সূর্যোদয়

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা সম্পাদিত

মৌলি প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❒ এপ্রিল ২০০১
স্বত্ব ❒ সম্পাদক
প্রচ্ছদ ❒ ইকবাল হোসেন সানু
প্রকাশক ❒ এস. কে. মাসুম, মৌলি প্রকাশনী ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
অক্ষরবিন্যাস ❒ দীপ্তি কম্পিউটারস ৩৮/২-খ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ❒ সালমানী মুদ্রণ ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
মূল্য ❒ ১৫০ টাকা

SATOI NOVEMBER JE DIN NATUN SURJYADOY : Edited by
M. Maniruzzaman Miah, Published by S. K. Masum, Mauli Prokashoni,
34 NorthBrock Hall Road Banglabazar, Dhaka 1100
Cover disign by Iqbal Hossain Sanu, Price : Taka 150.00
US$ 5

ISBN 984-751-013-X

একমাত্র পরিবেশক : **কাকলী প্রকাশনী**, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

BEGUM KHALEDA ZIA M.P.
LEADER OF THE OPPOSITION
IN PARLIAMENT

CHAIR PERSON
BANGLADESH NATIONALIST PARTY (B.N.P)
&
FORMER PRIME MINISTER OF BANGLADESH

শুভেচ্ছাবাণী

উনিশশো পঁচাত্তর সালের সাতই নভেম্বরের ঘটনাবলীর আমি চাক্ষুষ সাক্ষী। আমার পারিবারিক এবং রাজনৈতিক বিশেষ অবস্থানের কারণে এ বিষয়ে আমি কোনো মতামত প্রকাশ করি না। তবে অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করছি যে, এক রাজনৈতিক দুষ্টুচক্র যেন আমাদের সামগ্রিক জাতীয় জীবনের সবখানে ছায়া ফেলতে চাচ্ছে। রাজনীতিতে মত ও পথ আলাদা হতে পারে। কিন্তু অগণিত মানুষের চোখের সামনে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণও যখন ভিন্ন হয় তখন এসবের পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে।

সাতই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার যৌথ অভ্যুত্থান আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অনন্য ঘটনা। কেন ঘটেছিল এমন স্বতঃস্ফূর্ত কিন্ত সুনির্দিষ্ট ছকবিহীন একটি বিদ্রোহ? সমসাময়িক ঘটনাবলীর মূল্যায়ন সুকঠিন, কেননা সে ক্ষেত্রে প্রায়শই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি দেখা যায়। সময় আসলে ঐতিহাসিকরা এসবের মূল্যায়ন করবেন। তবুও দু-একটি কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। জিয়াউর রহমানকে বিনা কারণে অন্তরীণ করার ফলে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। ঐদিন তাদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। এই ছিল প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক কারণ। তবে অনুমান করি পেছনে আরো কারণ ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে শক্তিটি ক্ষমতাসীন হয়েছিল দেখা গেল তারা জনগণের জন্য কল্যাণকর কিছু তো করলই না বরং বহু কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করল। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের নাগপাশে আবদ্ধ হতে থাকলাম। এর ফলে আমদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনা যাদের অহরহ তাড়িত করে না সেনাবাহিনীর এমন সদস্য ও সাধারণ জনগণ ঐদিন অভ্যুত্থান ঘটাল। ঐদিনের সিপাহী জনতার উচ্ছ্বাস, তাদের শ্লোগান ও কর্মতৎপরতা আমাদের কাছে এভাবেই প্রতিভাত হয়েছে।

এ-পুস্তকে যাঁদের লেখা সংকলিত হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ৭ই নভেম্বরকে দেখেছেন। ঐ দিনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ইতিহাস লেখার সময় হয়তো এখনও আসেনি। তবে এসব লেখা ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হবে বলে মনে করি। এ-পুস্তকটি শহীদ জিয়াকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের সকলের সংগ্রহে থাকবে বলে আশা করি।

এ-সাথে পুস্তকের সকল প্রবন্ধকার এবং সম্পাদককে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

(খালেদা জিয়া)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

সিরাজুল হোসেন খান
প্রবীন রাজনীতিবিদ ; প্রাক্তন মন্ত্রী

আনোয়ার জাহিদ
বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ; সাবেক মন্ত্রী

আবদুল হাই শিকদার
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ
প্রধান সম্পাদক, ফাইনান্সিয়াল টাইমস

মনসুর আল মামুন
প্রাক্তন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার

ড. খলিলুর রহমান
অধ্যাপক প্রাণরসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন
বি. এন. পি সংসদ সদস্য

আমিনুর রহমান সরকার
সহ-সম্পাদক, দৈনিক দিককাল

কাজী সিরাজ
নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক দিনকাল

ড. আবদুল লতিফ মাসুম
অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাহবুব আনাম
প্রাক্তন সম্পাদক, বাংলাদেশ টাইমস

www.pathagar.com

সাদেক খান
নির্বাহী সম্পাদক, হলিডে

ড. এমাজউদ্দিন আহমদ
সাবেক উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা
সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক রাষ্ট্রদূত

ড. মাহবুব উল্লাহ
অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন প্রো ভি সি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আফতাব আহমাদ
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. কে এ এম শাহাদাত হোসেন মণ্ডল
প্রফেসর ইন্সটিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান
বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা

শাহ আহমদ রেজা
সাংবাদিক, ইনকিলাব

হারুনুর রশীদ
সাংবাদিক

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা

অধ্যক্ষ গণেশ হালদার
শিক্ষাবিদ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা / ৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : পটভূমি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ৭ নভেম্বর — সিরাজুল হোসেন খান / ২১
৭ নভেম্বর — আনোয়ার জাহিদ / ২৭
স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ — আবদুল হাই শিকদার / ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাতই নভেম্বর : যা ঘটেছিল

৭ নভেম্বর যা ঘটেছিল — রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ / ৪১
৭ নভেম্বর ও রেডিওর দুই নম্বর স্টুডিও — মনসুর আল মামুন / ৪৭
৭ নভেম্বর যেমন দেখেছি — ড. খলিলুর রহমান / ৫০
৭ নভেম্বর ছিল সিপাহী-জনতার-স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান — কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন / ৫৪
সাত নভেম্বর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ — আমিনুর রহমান সরকার / ৫৭
৭ নভেম্বরের চেতনা অবিনাশী — কাজী সিরাজ / ৬২
পঁচাত্তরের নভেম্বরে যা ঘটেছিল — ড. আবদুল লতিফ মাসুম / ৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সাতই নভেম্বর মূল্যায়ন ও তাৎপর্য

সংহতি দিবসের চেতনা অবমূল্যায়ন ইতিহাস বিরোধী — মাহবুব আনাম / ৮১
৭ নভেম্বর ভারত-নির্ভর দায়বদ্ধতার মুক্তি দিবস — সাদেক খান / ৮৬
সংহতি দিবসের তাৎপর্য — ড. এমাজউদ্দিন আহমদ / ৯০
৭ নভেম্বরের তাৎপর্য — ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা / ৯৫
৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য — ড. মাহবুব উল্লাহ / ১০০
আজকের বাংলাদেশ ও ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য — ড. আফতাব আহমদ / ১০৪
৭ নভেম্বর ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব — ড. কে এ এম শাহাদাত হোসেন মণ্ডল / ১১৬
চির ভাস্বর সৈনিক জনতা সংহতি — মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান / ১২৪
১৯৭৫-এর নভেম্বর : রাজনীতির দুটি ধারা — শাহ আহমদ রেজা / ১২৮
কর্নেল তাহের কি "বঙ্গবন্ধু" প্রেমী ছিলেন? — হারুনুর রশীদ / ১৩৬

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সংগঠক জিয়াউর রহমান

রাজনিতিবিদ জিয়াউর রহমানের সংগঠন কৌশল   অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী / ১৪৫
৭ নভেম্বর স্মৃতিতে অম্লান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান   অধ্যক্ষ গণেশ হালদার / ১৫৪

পরিশিষ্ট-১

৭ নভেম্বর : সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়সমূহ / ১৬১

পরিশিষ্ট-২

৭ই নভেম্বর : ইতিহাস কথা কয় : সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন-
উল্লাসমূখর দেশ, উদ্বেল রাজধানী / ১৭০

www.pathagar.com

ভূমিকা

সে দিন ছিল ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সাল। কাকডাকা ভোরে বিচিত্র রকমের হৈ চৈ-এর কারণে ঘুম ভেঙে গেল। কয়েকদিন আগে থেকে জাতীয় জীবনে একটা অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। তিন তারিখ থেকে কতগুলো ঘটনা ঘটছিল, যেগুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে নানা গুজব চারপাশে শোনা যাচ্ছিল। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার যে একটা পরিবর্তন হয়েছিল তা বোঝা গিয়েছিল। বোঝা গেল এ কারণে যে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন, তা টিভিতে দেখা গেল। এ-ও দেখা গেল যে, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীপ্রধানদ্বয় নতুন সেনাবাহিনীপ্রধান খালেদ মোশাররফের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে তাকে ব্যাজ পরাচ্ছেন।

সে যাই হোক, গোলমাল শুনে বাইরে কী ঘটছে জানবার জন্য আমার চার তলার ফ্লাট থেকে নিচে নেমে আসলাম। একটু আগে বা পরে ঐ দালানেরই বাসিন্দা আমার এক সহকর্মী অধ্যাপকও নিচে নেমে এসেছেন। আমরা থাকতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের ফ্ল্যাটে। একজন অপর জনকে দেখে সাহস কিছুটা বাড়ল। আমরা তখন একসঙ্গে হেঁটে নীলক্ষেত বাজারের দিকে এগোলাম। দেখলাম লোকে লোকারণ্য। বিশৃঙ্খল অথচ উৎফুল্ল এবং নির্দোষ এমন জনতা আর কখনো দেখা যায়নি। তারা যে সব শ্লোগান দিচ্ছিলেন তার সঠিক ভাষ্য আজ সবটা মনে নেই। তবে সেগুলো ছিল মূলত সিপাহী-জনতার ঐক্য ও সংহতির পক্ষে, সব রকমের আধিপত্যবাদবিরোধী ও জিয়াউর রহমানের মুক্তির কথা উল্লেখ করে। সকালের দিকে রেডিওতে যেসব বক্তৃতা ও ঘোষণা ভেসে আসতে লাগল তা থেকে বোঝা গেল যে রাজনৈতিক পট আবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর আগে ৩ নভেম্বরের খালেদ মোশাররফের ক্যু ক্যান্টনমেন্টের সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যরা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তিন তারিখের খালেদ মোশাররফের ক্যু সম্পর্কে দু-একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক, এদেশের মানুষ আকাশবাণী থেকে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের কথা প্রথম জানতে পারে, বাংলাদেশের রেডিও থেকে নয় এবং আকাশবাণীর ঘোষণায় খালেদ মোশাররফের প্রতি এক ধরনের সমর্থনের সুর পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

দুই, ৪ নভেম্বর শহীদ মিনার ও ক্যাম্পাস এলাকায় একটি মিছিল বের হয়। এর পুরোভাগে ছিলেন খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধ মাতা ও তাঁর ভাই (বর্তমানে মন্ত্রী)। এ শোভাযাত্রা থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয় যে, এ সভা আগেই আহবান করা হয়েছিল।

এরপর আসে ৭ নভেম্বর, যে কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। ঐদিন সিপাহী জনতা যৌথভাবে অন্তরীণ সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে আনেন ও তিনি পুনরায় স্বপদে বহাল হন। জাস্টিস সায়েম প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকেন।

উল্লেখ্য যে ইতোপূর্বে জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ করে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ তার ক্যু সংঘটিত করেন। তার অন্তরীণ অবস্থায় খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমানের পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেন।

এ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর তৎকালীন লেঃ কর্নেল এম. এ. হামিদ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ।

"এখানে অবাক হওয়ার ব্যাপারে হলো, মাত্র কিছুদিন আগে সপরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনী সদস্যদের হাতে নিহত হন। কিন্তু তার মৃত্যুঘটনা নিয়ে সৈনিকরা উত্তেজিত হয়নি, বিশেষ মাথাও ঘামায়নি, অথচ জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়ায় অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সৃষ্টি হলো প্রবল অসন্তোষ।

"দু-দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে দারুণ অনিশ্চয়তার ছাপ। সেনাসদরে গুঞ্জন। কাজকর্ম সব বন্ধ। অসন্তোষ চরমে।

"খবর ছড়িয়ে পড়লো, জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। চাপের মুখেই তা করেছেন। একখানা সাদা কাগজে তার স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পত্রে দস্তখত নেয়া হয়েছে। একই পত্রে পেনশনের আবেদন করেছেন। খালেদের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার রউফ তার কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র সই করিয়ে নিয়ে আসেন। গৃহবন্দি জিয়া পদত্যাগপত্র সই করতে বাধ্য হয়েছেন। "এতে জিয়ার প্রতি সবার সহানুভূতি আরো বেড়ে গেল। (লেঃ কর্নেল এম. এ. হামিদ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা)।

এ সময়ের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী লেঃ কর্নেল হামিদ তার বই-এ ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কোথায় কী ঘটছিল তারও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বন্দিদশা থেকে কীভাবে জিয়াউর রহমানকে সিপাহীরা মুক্ত করল সে কাহিনী তিনি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন।

"বন্দি জিয়াউর রহমানকে কিভাবে উদ্ধার করা হলো? তাকে খালেদ শাফায়েত তার বাসভবনেই ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন গার্ড দিয়ে

www.pathagar.com

আটকে রেখেছিল। রাত বারোটায় সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। তখন থেকেই বিপ্লবীরা এবং সিপাহীরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে বেরিয়ে এসে স্বতঃস্ফুর্তভাবে জিয়ার বাসভাবনের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। সবারই লক্ষ্যস্থল ছিল জিয়ার বাসভবন।"

"সবাই সেখানে একত্র হয়ে দুর্গ ভেঙে বন্দি জিয়াকে বের করে আনবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা।"

"মেজর মহিউদ্দিন, সুবেদার মেজর আনিস এবং টু ফিল্ডের কিছু সৈনিক যখন জিয়ার বাসার গেইটে পৌঁছে যায় তখন চতুর্দিকে ভীষণ ফায়ারিং চলছে। ফার্ষ্ট বেঙ্গলের গার্ডরা, যারা তাকে বন্দি করে রেখেছিল, প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে ফায়ার করতে করতে পেছন দিকে পালিয়ে গেল। মহিউদ্দীনের লোকজন জিয়ার বাসার ছাদ লক্ষ্য করে কয়েকবার অটোমেটিক ব্রাস ফায়ার করলো। ভেতর থেকে গার্ডরা আর কোন জবাব দিল না। তখনই তারাই রাইফেলের বাট দিয়ে গেইট ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢোকে। এই সময় জিয়ার ড্রাইভার বেরিয়ে আসে।"

সে শ্লোগানমুখর সৈনিকদের জিয়ার বাসার পশ্চিম পাশে কিচেন রুমের দিকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা দরজা খোলার জন্য চিৎকার দিতে থাকে। জিয়া এবং বেগম জিয়া তখন পেছনে করিডোরে বেরিয়ে আসেন। এই সময় বাসার চারদিকে ফায়ারিং চলছিল। বহু সৈনিক চিৎকার দিতে দিতে বাসায় ঢুকে পড়লো উত্তেজনায় ভরপুর প্রতিটি মুহূর্ত।

মহিউদ্দীন বললো :

স্যার, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আপনি আসুন।

জিয়া বললেন, দেখ, আমি এখন রিটায়ার করেছি। আমি কিছুর মধ্যে নাই। আমি কোথাও যাব না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

স্যার, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আমরা নিয়েই যাব। আপনাকে আমরা আবার চীফ বানাতে চাই। দোহাই আল্লাহর, আপনি আসুন। মহিউদ্দীনের দৃঢ় আহবান।

বেগম জিয়া পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এ রকম গোলাগুলী ও গণ্ডগোলের মধ্যে স্বামীকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনিও বললেন, 'দেখুন ভাই, আমরা রিটায়ার করেছি। আমাদের নিয়ে টানাটানি করবেন না। দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন।'

"মহিউদ্দীন বলল, স্যার, আপনাকে যেতেই হবে, আপনি আসুন। বলেই মহিউদ্দীন, আনিস ও অন্য সিপাইরা তাকে একেবারে চ্যাংদোলা করে কাঁধে উঠিয়ে অপেক্ষমান জীপে নিয়ে তুলে ফেলল। চতুর্দিকে শ্লোগান উঠলো।"

www.pathagar.com

আল্লাহু আকবার।
জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ!
সিপাহী-সিপাহী ভাই ভাই!

"বেগম খালেদা জিয়া তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে অতীব উৎকণ্ঠা ও আনন্দের সাথে অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইলেন। ততক্ষণে আরো বহু সৈনিক, বহু বিপ্লবী এদিক সেদিক ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে গেছে। জিয়াকে মুক্ত দেখে সবার আনন্দের সীমা নাই। চতুর্দিকে মুহুর্মুহু শ্লোগান। 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ।'

জিয়াউর রহমান মুক্ত হলেন। তখন সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা। সাধারণ সিপাহীরা কোন কোন অফিসার এবং তাদের স্ত্রীদের হত্যা করেছে। মনে হচ্ছিল সেনাবাহিনী আর বুঝি শৃঙ্খলায় ফিরে আসবে না। কিন্তু নিজের নিরাপত্তার কথা আমলে না এনে তিনি প্রচণ্ড সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলেন বিশৃঙ্খল অবস্থায় অবসান ঘটাতে। লেঃ কর্ণেল হামিদ বলছেন ঃ

"আমি জিয়াকে খুজছিলাম। তিনি পাগলের মত এখানে ওখানে ঘুরছিলেন। চতুর্দিকে গন্ডগোল থামাতে ক্যান্টনমেন্টের সবখানে ছুটে গিয়ে সিপাহীদের এসব কান্ড বন্ধ করতে বললেন। তারা বিভিন্ন দাবি পেশ করল। জিয়া বললেন, আগে তোমরা অস্ত্র জমা দাও। আমি সব দাবি মানবো।"

"জিয়া স্পষ্ট ভাষায় সৈনিকদের বললেন, আপনারা হাতিয়ার জমা দিন। শৃঙ্খলার মধ্যে আসুন। ব্যারাকে তাড়াতারি ফিরে যান। অযথা রক্তপাত করবেন না। আপনারা ক্যান্টনমেন্টে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন।"

উপরে বিধৃত ঘটনাবলি থেকে যা স্বতঃসিদ্ধভাবে বেরিয়ে আসে তা এই, ৭নভেম্বরের অভ্যুত্থান মুলত সেনাবাহিনীর জোয়ানদের অংশগ্রহণে সংঘটিত হয়।

দুই, ৩ নভেম্বরের ক্যু-এ কোনো মহলের সমর্থন ছিল না, থাকলে তা অন্তত কিছুকাল স্থায়ী হতে পারত।

তিন, ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর বা ৭ নভেম্বর সংঘটিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি ঘটনাক্রমে ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তরীণাবস্থা থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, এখানে তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রশ্ন আদৌ বিবেচ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের আগমন আকস্মিকভাবেই। প্রথমবার ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। ঐ সময়ে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যখন অতর্কিতে এদেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, রাজনীতিবিদরাসহ সারাদেশের মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ইতোপূর্বে মাসব্যাপী অসহযোগ

www.pathagar.com

আন্দোলনের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা স্পৃহা মানুষের মনে প্রজ্বলোন্মুখ ছিল এই একটি ঘোষণার ফলে তা জ্বলে উঠল। সারা দেশের জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

আর একবার তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে আসলেন ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর। ঐ দিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে বিভিন্নজনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। মতপার্থক্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যা দূর্ভাগ্যজনক তা হচ্ছে– তথ্য উল্লেখ না করে ঘটনাবলির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা। এসব অপপ্রচারের উদ্দেশ্য একটাই ও লক্ষ্যও একজন ব্যক্তি। মূল উদ্দেশ্য, কীভাবে জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি মসিলিপ্ত ও তার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বি. এন. পি-কে বিতর্কিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা নিরঙ্কুশ করা যায়। তবে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর তো মাত্র সেদিনের কথা। ঐ সময়ের লাখো-কোটি মানুষ আজও বেঁচে আছেন ও তাদের চোখের সামনে সংঘটিত ঘটনাবলি ভুলে যাননি। সে যাই হোক, যে অভিযোগগুলো প্রায়শই করা হয় তা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের কি ভূমিকা ছিল? প্রশ্নটি অনেক সময় ঘুরিয়ে বলা হয় যে, ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলির প্রধান সুবিধাভোগী ছিলেন জিয়াউর রহমান। ভাবখানা এই যে, তিনি যেন ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন। প্রশ্নটি এতই অবান্তর যে, এর উত্তর দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আমরা যেহেতু প্রকৃত ঘটনা ভুলে যাই বা স্বার্থের কারণে ভুলে যেতে চাই, তাই ৭ নভেম্বরের পটভূমি আর একবার সংক্ষেপে ঝালিয়ে নেয়া দরকার।

১৯৭৫ -এর ১৫ আগস্ট দেশে একটি সামরিক ক্যু সংঘটিত হয়, যার ফলে তৎকালীন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বাকশাল মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমাসীন হন। তখন সেনাপ্রধান ছিলেন বর্তমান সংসদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জেনারেল শফিউল্লাহ। পরবর্তী পর্যায়ে ৩ নভেম্বর তৎকালীন সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি খালেদ মোশাররফ আর একটি পাল্টা সামরিক ক্যু ঘটান। ঐ সময়ে সেনাপ্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। খালেদ মোশাররফ খন্দকার মোশ্‌তাককে সরিয়ে প্রধান বিচারপতি সায়েমকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ করে রাখেন এবং তার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার ব্যবস্থা করেন। জিয়াউর রহমানের টেলিফোন সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে বাইরের সকল যোগাযোগ বন্ধ করা হয়। এ সময় একটি গুজব ছড়িয়ে যায় যে, খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগ ও একটি বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে পাল্টা ক্যু ঘটিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় সেনাছাউনির হাজার হাজার সাধারণ সৈনিক ও

www.pathagar.com

জনতা একত্র হয়ে একটি অভ্যুত্থান ঘটান। এরা যে কেবল গৃহান্তরীণ থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেন তা-ই নয়, তারা তাকে কাঁধে করে (আক্ষরিক অর্থেই) রাস্তায় মিছিল করেন। এ ঘটনা ঘটে ৭ই নভেম্বর, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

যেহেতু ৩ নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি ছিলেন তাই সেদিনের অভ্যুত্থানের সাথে তার কোনো সম্পর্কের প্রশ্নই আসে না। ঘটনা বিশ্লেষণে এ-ও দেখা যাবে যে, ১৫ আগস্ট বা ৩ নভেম্বরের সেনাবাহিনীর কোনো তৎপরতার সাথে তার কোনোরূপ যোগাযোগ কল্পনা মাত্র। সাত নভেম্বর তিনি ঘটনাক্রমে রাজনৈতিক অঙ্গনে এসে পড়েন। এটি তার ওপর সেনাবাহিনীর জোয়ানদের আস্থার প্রকাশ মাত্র।

আর একটি অভিযোগ করা হয় যে, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় এই অভিযোগটিও সম্পূর্ণ অসত্য। ১৫ই আগস্টের ক্যু দেতার পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ। তিনি ২০ আগস্ট সামরিক শাসন জারি করেন, যা ১৫ আগস্ট থেকে বলবৎ করা হয়। খালেদ মোশাররফের আগমনের ফলে মোশ্‌তাক অপসারিত হন, কিন্তু সামরিক আইন চালু থাকে। মোশ্‌তাক আহমদের স্থলে খালেদ মোশাররফ বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন করেন। এসবই জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক মঞ্চে অধিষ্ঠানের আগে।

জিয়াউর রহমান সেই অবস্থার তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন করেননি। তখনকার অবস্থায় তা সম্ভব ছিল না। কারণ তখনকার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ করেন। এ সমস্ত তো সকলের জানা এবং দলিলপত্রে এসব ঘটনার প্রমাণ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন একথা যারা বলেন তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই সঠিক কথা বলেন না।

জিয়াউর রহমান নাকি গণতন্ত্র হত্যা করেছেন, এ অভিযোগও তোলা হয়। এ-ও প্রকৃত ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। যা অনেকে ভুলে যান, হয়তো-বা ইচ্ছে করেই, তা এই যে ১৯৭৫-এ আওয়ামী শাসনামলে যখন বাকশাল সৃষ্টি করা হয় সেদিনই বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বাকশাল সৃষ্টির ফলে আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয় এবং চারটি সরকারি পত্রিকা বাদ দিয়ে সব পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অথচ পত্র-পত্রিকাই হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বাহন। অর্থাৎ গণতন্ত্র মোশ্‌তাকের সামরিক শাসন জারির আগেই আওয়ামী সরকারের আমলে ১৯৭৫ -এর জানুয়ারী মাসে সমাহিত

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। এদিকে ঠুঁটো জগন্নাথ যে সংসদটি ছিল তাও ৬ নভেম্বর অর্থাৎ খালেদ মোশাররফের সময় ভেঙে দেয়া হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতারোহণের এক বছরের মধ্যে যারা রাজনৈতিক দল গঠন করতে চেয়েছেন তিনি আইন করে তাদের এক একটি দলে সংগঠিত হতে দিয়েছেন। এভাবে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগেরও পুনর্জন্ম হয়। অর্থাৎ আজকের আওয়ামী লীগ সেই পুরনো আওয়ামী লীগ নয়, এ দলের জন্ম ১৯৭৬ সালের তৎকালীন সামরিক সরকারের অনুমতিক্রমে। পুরনো দলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে জিয়াউর রহমান দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সূচনা করেন , যা পূর্বের আওয়ামী লীগ আমলে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আর একটি অভিযোগ করা হয় যে, জিয়াউর রহমান ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের আইনের বর্ম দিয়ে রক্ষা করেছেন। একথাও সঠিক নয়। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স আসলে মোশ্‌তাক আহমদ ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জারি করেন, জিয়াউর রহমান এর প্রবর্তক নন।

কিন্তু জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে কেন এই অপপ্রচার? এর উত্তর ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি থেকেই পাওয়া যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ৭ই নভেম্বরে সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং জনগণের অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আর এর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, নভেম্বরের খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ ক্যু। তিন নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর ঘটনাবলি যেভাবে গড়াচ্ছিল, তাতে সেনাবাহিনী এবং জনগণের এমন মনে করার কারণ ছিল যে, বাংলাদেশ পুনর্বার আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের শিকার হতে যাচ্ছে। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান তাই ছিল, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে। এমনও মনে করা হয় যে, এ বিপ্লব সম্প্রসারণবাদের এদেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে। স্বভাবতই জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক মঞ্চে আকস্মিক অধিষ্ঠান তারা কখনো মেনে নিতে পারে নি। একথাও তারা কখনো হজম করতে পারে না যে, একজন সেনা কর্মকর্তা দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করবেন। কারণ দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, 'গণতন্ত্রের' কথা মুখে বললেও এদেশীয় জনপ্রতিনিধিরা গণতন্ত্র হত্যা করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মূল কারণ এখানে নিহিত।

সে যাই হোক, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার যেহেতু বাতিল করা যাবে না (এদেশীয় নব্য স্বৈরাচাররা হয়তো সে চেষ্টা ও করতে পারে কে জানে!) সেহেতু ৭ই নভেম্বর ঘুরে ঘুরে আসবেই আর মানুষকে বারবার আন্দোলিত করে যাবে। ইতিহাসের সাথে স[illegible]ংকার কারো কারো যেন ললাটের লিখন। শহীদ জিয়াউর রহমানের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাহ[illegible] বলে মনে হয়। ১৯৭১ -এর যেদিনে তিনি

www.pathagar.com

স্বাধীনতালিপ্সু বাংলাদেশের জনগণের মনের দাবি 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করলেন সেদিন তিনি চট্টগ্রাম সেনাছাউনির একজন মেজর মাত্র। আশেপাশের সহকর্মীদের ছাড়া কেই-বা জানত তাঁর নাম। কিন্তু ওই একটি কাজ তাঁকে দিল অমরত্ব, আর তিনি অংশ হয়ে রইলেন ইতিহাসের। বাংলাদেশের বর্তমান শাসনকর্তাদের তাঁর প্রতি ক্রোধের কারণ প্রথমত এখানেই। কারণ এ পবিত্র দায়িত্বটি পালন করার কথা ছিল তাদের। কিন্তু যা তারা বুঝতে অক্ষম তা এই যে কারো ব্যর্থতার জন্য ইতিহাসের চাকা তো বসে থাকবে না। নির্মোহ জীবনদৃষ্টির অধিকারী জিয়াউর রহমান তাঁর কাজ সম্পাদন করে চলে গেলেন পেছনের কাতারে। কিন্তু ইতিহাসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার তো হতেই হবে। না হলে সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ কে ঠেকাবে? আবার তাঁকে আসতে হলো ১৯৭৫ -এর ৭ নভেম্বর, দ্বিতীয় রাঁদেভূ ইতিহাসের সাথে। সে ঘটনার পটভূমি লোমহর্ষক, কিন্তু ফল চিত্তাকর্ষক ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী। এ কারণেই তিনি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। কী ছিল ৭ই নভেম্বরের পটভূমি তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেকোনো বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘদিনের পূর্বপরিকল্পনা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ছিল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।৭ই নভেম্বর যে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা অগণিত জনতার সাথে একযোগে এক বিপ্লব ঘটালো তার পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল জওয়ানদের মনের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর হতাশা। যে জনতা তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল তারা খালেদ মোশাররফের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আবারও সম্প্রসারণবাদ ও আধিত্যবাদের প্রত্যাগমনের আলামত দেখতে পাচ্ছিল। তাদের মনে এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় একারণে যে, তারা দেখছিল যে স্বাধীনতার ঘোষক তাদের প্রিয় সেনাপতিকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। স্বভাবতই তারা ফেটে পড়ে বারুদের মতো। ওইদিন উৎফুল্ল সিপাহী-জনতা শহরের পথে পথে যে সব স্লোগান দিচ্ছিল তার থেকে এর প্রমাণ মেলে। প্রকৃতপক্ষে ওই দিনের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ছিল তাদের দেশপ্রেমিক চেতনার বিষ্ফোরণ।

সে থেকে দু দশক যাবৎ ৭ই নভেম্বর 'বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর এ দিনটির তাৎপর্য ম্লান করার জন্য একে ঘোষণা করেছে সেনাহত্যা দিবস হিসেবে। খুব সম্ভবত তারা বুঝতে চায় না যে, তাদের এরূপ আরচণ সেই ধারণাকেই সমর্থন করছে যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ক্যু ছিল আসলে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের পক্ষে। একথা ঠিক যে, জওয়ানদের চাকরিজীবনের নানান বঞ্চনাকে পুঁজি করে তাদের মধ্যে কোনো কোনো মহল অফিসার-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলেছিল, যার ফলে কোনো কোনো সেনাসদস্য তাদের প্রতিহিংসার শিকার হন। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্তির পর জিয়াউর রহমান যেভাবে এই

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটান তাতেও তার নেতৃত্বের গুণের প্রভুত পরিচয় মেলে। লেঃ কর্নেল হামিদ যিনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ওই সময়ের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন তার প্রকাশিত পুস্তক থেকে আমরা পাই যে যখন উত্তেজিত সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করলো তখন যেভাবে জিয়াউর রহমান তাদের মুখোমুখি হয়ে দৃঢ়তার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করেন ও বিদ্রোহ প্রশমিত করেন তা অতুলনীয়। নেতৃত্বের গুণ ও ব্যক্তিত্ব থাকলেই কেবল শ'শ বিদ্রোহী, অস্ত্রধারী বিপ্লবী লোকজনদের কেউ এমনভাবে হুকুম দিতে পারে। এভাবে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর মধ্যে পুনর্বার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এ সবকিছুর বিচারে ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দিনের তাৎপর্য সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) একাধিক ক্যু ও পাল্টা ক্যু -এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল, যা সেনাবাহিনীর জন্য তো বটেই, দেশের জন্যও খুবই ক্ষতিকর হচ্ছিল। দায়িত্ব নেয়ার পরই জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে ব্রতী হন ও এ কাজে তিনি কৃতকার্য হন। স্বাভাবতই স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি, তাঁর প্রবচনসম সততা, তাঁর অপরিমেয় সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দেশপ্রেম এ কাজে তাঁর সহায়ক হয়।

(২) সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান মূলত ছিল আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সিপাহী-জনতার প্রতিবাদ। স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী শাসনামল, মধ্য-আগষ্টের ক্যু, ৩ নভেম্বরের পাল্টা ক্যু, ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান ইত্যাদি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিকভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(৩) একদলীয় বাকশালী শাসনের বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বর ছিল জোরালো প্রতিবাদ। এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, ১৯৭৫ -এর জানুয়ারী মাসে রাতারাতি দেশের সংবিধান পরিবর্তন করে একদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু করা হয়। এটি আসলে ছিল একটি 'রাজনৈতিক ক্যু'। এরপর আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয় এবং সরকারঅনুগত পত্রিকা বাদে সকল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করা হয়। ৭ নভেম্বর এ ধরনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষ ও সেনাবাহিনীর জওয়ানরা।

(৪) প্রকৃত অর্থে একটি দেশপ্রেমিক সরকার গঠন যার মাধ্যমে দেশের সত্যিকার অর্থে কল্যাণ হবে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান তারই বার্তাবহ। যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এসব দায়িত্ব পালনের কথা তা তারা পারেনি। আর তাই জিয়াউর রহমানের সফল নেতৃত্বের প্রতি তাদের আক্রোশ।

www.pathagar.com

এখানে সন্নিবেশিত নিবন্ধগুলো থেকে ৭-ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ঐ দিনের ঘটনাবলি ও দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। এ পুস্তকে যে নিবন্ধগুলো সংকলিত হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর রচয়িতা সকলেই দায়িত্বশীল ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রচনা প্রায় অবিকলভাবেই এখানে মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদনাকালে বানানের সমতা আনয়ন, বা তথ্য শুদ্ধি বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষার সহজীকরণের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন কেবলমাত্র ততটুকুই মূল লেখার পরিবর্তন করা হয়েছে, তার বেশি নয়। নিবন্ধকার প্রত্যেকেই ৭-ই নভেম্বরকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন ও এর তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। যদিও প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় ৭-ই নভেম্বরের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে তবুও পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটির মূলসুর অনুসারে এগুলোকে সম্পাদনাকালে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ পরিচ্ছদে যে দুটি নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে তা হয়তো ৭-ই নভেম্বরের ঘটনাবলির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে অনভিজ্ঞ শহীদ জিয়ার সংগঠন কৌশল যে অনন্য ছিল সে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য এ দুটি সংকলিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সততা, দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে যে একজন মানুষ জাতীয় জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারে জিয়াউর রহমান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐ দিন যে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সূর্যোদয় হয়েছিল তা স্বীকার করলে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের দোসর,মুৎসুদ্দী ও অগণতান্ত্রিক শক্তির সব রাজনৈতিক জারিজুরি শেষ হয়ে যায়। আর সে কারণেই তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে অবিরাম অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ একই কারণে জিয়াউর রহমানের অনুসারীদের বারবার ৭-ই নভেম্বরের কথা বলতে হবে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে ৭-ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সম্মিলিত উত্থানের সাথে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। আর তা-ই ঐ দিনের তাৎপর্য অনুধাবন করা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অনুসারী সকলের কর্তব্য। এ পুস্তকটি যদি সে উদ্দেশ্য সাধনে সামান্যতম অবদানও রাখে তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব।

এ পুস্তকে যাঁদের নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে তাঁদের সকলকে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। এ সাথে ধন্যবাদ জানাই মৌলি প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী জনাব এস. কে. মাসুমকে, তাঁর আগ্রহ ছাড়া এ-টি প্রকাশিত হতোনা।

ঢাকা, স্বাধীনতা দিবস, ২০০১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ : পটভূমি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সিরাজুল হোসেন খান
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ৭ নভেম্বর

সেই ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে যে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয়, তারই স্মরণ ও স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৬ সাল থেকে এ দিনটি 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' হিসেবে বাংলাদেশে পালিত হয়ে আসছে। ঐ সাল (১৯৭৬) থেকেই ৭ নভেম্বর পালিত হয় সরকারি ছুটির দিন হিসেবে। জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস নিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে দেশে কোনো প্রকাশ্য বিতর্ক ছিল না।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ১৯৯৬-এর জুন মাসে। ঐ বছর (১৯৯৬) ৭ নভেম্বর ছিল সরকারি ছুটির দিন। ১৯৯৭ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আদেশবলে ৭ নভেম্বর সরকারি ছুটির দিন বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ হাসিনা সরকার জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস প্রশ্নে একটি ভিন্নমত বা বিতর্ক প্রথম প্রকাশ্যে উত্থাপন করলেন।

যাহোক, জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য নিয়ে যে-কোনো আলোচনা করতে গেলেই সর্বপ্রথমে তার পটভূমি স্মরণ করতে হয়। পটভূমিটি গড়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রার শুরুকাল থেকেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ঢাকার রমনা রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের শুরু দিয়ে।

রেসকোর্সের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীপ্রধান বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে আত্মসমর্পণ করেন ভারতীয় সেনাপতি লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে। এমন কি, জেনারেল ওসমানী সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। কেন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, সে প্রশ্ন আজও জনমনে বিঁধে আছে এবং বলা যায়, সেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান থেকে বাংলাাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্টীয় সার্বভৌমত্বের ওপর ভারতীয় আধিপত্যের ছায়া বিরাজ করে আসছে অথবা বিরাজ করার প্রয়াস পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭২-এর জানুয়ারির ১০ তারিখ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাবাস থকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করার পরপরই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, দল-মত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক পার্টির সাথে আলাপ-আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন। তদনুযায়ী ১১ জানুয়ারি আইনের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান সম্পন্ন করে তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে রাষ্ট্রপতির পদে বসান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে এবং নিজে রাষ্ট্রপতির

www.pathagar.com

পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচক্ষণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বিবেচনায় জনমতের অনুকূলে তাঁর পদক্ষেপ সেখানে গিয়েই থেমে যায়। তিনি আর অগ্রগতি বা প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁর ওপর চেপে বসে উপমহাদেশের শক্তিধর রুশ-ভারত মহল। ভারত-মার্কিন মহলের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা ছিল তখন অধিকতর প্রবল।

১৯৭১ সালের যুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের সঙ্গে যে মৈত্রী চুক্তি করে, তা ছিল মস্কো কর্তৃক একটি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ঘোষণা যে, রাশিয়া সে যুদ্ধে ভারতের পক্ষে প্রয়োজনানুযায়ী দাঁড়াবে। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত-মার্কিন মহলও একেবারে নিশ্চুপ বসে ছিল না।

পাকিস্তানে, ভারতে এবং বাংলাদেশে তারাও ছিল সক্রিয়। বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী ভারতের মাঝে দ্বন্দ্ব এবং একই সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে রুশ ও মার্কিন চক্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপমহাদেশে যে উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির সৃষ্টি করে, তার মধ্যে মাথা উঁচু করে এবং মাথা ঠিক রেখে দাঁড়ানোর মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও শক্তি বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল না এবং ছিল না বলেই বাংলাদেশের ওপর সন্দেহ-বিপদ নেমে আসে এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারই দেশের জন্য একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে ওঠে। এ কথাটির আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যখন তাঁর পূর্বোক্ত ইচ্ছা বা অভিলাষ অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট সর্বদলীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা ও নতুন দেশ গড়ার কাজে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখনি তার পূর্বে রুশ-ভারত চক্রের চাপাচাপিতে তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ভারতীয় ধনিক-বণিক শ্রেণীর হাতে তুলে দিতে এবং বাংলাদেশকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশের জননেতা শেখ মুজিব দেশবাসীর কাছে বনে যান স্বৈরাচারী একনায়ক এবং আধিপত্যবাদী ভারতের কাছে মাথা নত করে হয়ে যান তাদের তল্পীবাহক। বাংলাদেশের জনগণের জন্য এটাই ছিল চরম দুর্ভাগ্য যে, তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের এমনি এক অসহনীয় পরিণতি দাঁড়াবে রাতারাতি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার তার শাসন শুরুর কিছুকাল পর থেকেই শাসকদল আওয়ামী লীগ ও তাদের এবং নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হয় রাজনৈতিক পদস্খলন এবং সেই পদস্খলন শেষ পর্যন্ত একদলীয় বাকশালী রাজনীতি ও শাসনের মধ্য দিয়ে হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক মরণ। ১৯৭৫-এর আগস্টের ১৫ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারসহ দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের

www.pathagar.com

মাস কয়েক পূর্বে ঘটেছিল সেই রাজনৈতিক মরণ।

আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক পদস্খলন থেকে রাজনৈতিক মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড় বয়ে যায়, তা ছিল অচিন্তনীয় এবং অবিশ্বাস্য।

বাংলাদেশের মানুষ ভাবতেও পারে নি, দু-দুবার স্বাধীন হয়েও তাদের দুর্ভাগাই থেকে যেতে হবে। এক কথায়, আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি একবারে ভেঙে পড়ে এবং দেশটি এক অসহনীয় দুর্ভিক্ষের মুখে পতিত হয়ে ১৯৭৪ সালে ৫ লক্ষাধিক মানুষকে হারায়।

জিনিসপত্রের দাম হয়ে উঠে আকাশচুম্বী। এক সের লবণের দাম যখন হয় ৩০ টাকা থেকে ৯০ টাকা, তখন আওয়ামী লীগের জন্য সাধারণ মানুষের মুখে ছিল শুধু অভিসম্পাত। সর্বোপরি, আওয়ামী লীগ সরকারের অবর্ণনীয় দুঃশাসন, আওয়ামী লীগের লোকজনের দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্য, খুন-খারাবি-হাইজ্যাক, হত্যাকাণ্ড, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি সবকিছু মিলে বাংলাদেশকে রাতারাতি করে ফেলে একটা দুঃস্বপ্নের দেশ।

এমনি অসহনীয় অবস্থার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যখন মানুষ সংগঠিত আকারে করতে থাকে, তখন চলে সরকারের 'রক্ষীবাহিনী' এবং সরকার দলীয় 'লালবাহিনী', 'নীলবাহিনী' ইত্যাদি কর্তৃক দেশময় হত্যাযজ্ঞ। তিন বছরে প্রায় ৩৭ হাজার বিভিন্ন বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে করা হয় হত্যা। তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগেরও প্রায় ৫ হাজার মানুষকে করা হয় বধ।

এ পরিস্থিতিতে মুজিব সরকার যে চরম দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা সংক্ষেপে ছিল যে, ৬৪টি মহকুমার (বর্তমানে জেলা) প্রতিটিতে একজন করে আওয়ামী লীগ দলীয় গভর্নর ও তার অধীনে বেশ কিছুসংখ্যক নরঘাতক 'রক্ষীবাহিনী' বসানো সম্পন্ন হয়। এ ব্যবস্থা স্পষ্টতই ছিল দেশময় একটা হত্যার আয়োজন। এমনি অবস্থায় যখন বাংলাদেশ এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন, তখনি ঘটে শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড।

স্মর্তব্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আচমকা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রেসিডেন্টরূপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার শীর্ষস্থানীয় সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমদের নবগঠিত সরকারে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অনেক নেতা যোগদান করেন।

দেশ তখন ছিল সামরিক আইনের অধীনে। বলাবাহুল্য, শেখ মুজিব আওয়ামী বাকশালের পতনের পরও রুশ-ভারত মহল বাংলাদেশে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাদের অনুসারীদের তারা গোপনে সক্রিয় করে তোলে।

এরই এক পর্যায়ে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোস্তাক আহমদের আড়াই মাস

www.pathagar.com

অবস্থানের পর ঐ বছর (১৯৭৫) পয়লা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশ বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মোস্তাককে দিয়ে বিভিন্ন আদেশ জারি করে নেয়।

পয়লা নভেম্বর খন্দকার মোস্তাকের সভাপতিত্বে তার মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐ মন্ত্রিসভার কোনো সিদ্ধান্ত কোথাও প্রকাশ পায় নি.। পরে জানা যায়, খালেদ মোশাররফদের পরিকল্পনা ছিল যে, খন্দকার মোস্তাক আহমদকে দিয়ে একটি ঘোষণা জারি করাবেন, যার বলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি মুজিব আমলের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের সূচনা করবেন। এ ধরনের একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করতে অস্বীকার করলে অন্য আরেকজন ব্রিগেডিয়ার খন্দকার মোস্তাককে গুলি করতে উদ্যত হন।

তখন বঙ্গভবনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত জেনারেল ওসমানী অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং সবাইকে শান্ত করেন। বঙ্গভবনে যখন এমনি এক টলটলায়মান উত্তপ্ত অবস্থা চলছে এবং যখন শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে জড়িত সেনাবাহিনীর অংশের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ দু-একদিনের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন এবং আওয়ামী বাকশালী রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন তাদের হাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপরোক্ত ৪ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে নিহত হন। তাদের মৃতদেহ ৪ নভেম্বর তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। ঐ ৪ নভেম্বর আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঢাকা শহরে ঘটে। ঐদিন আওয়ামী লীগের লোকজনের একটি মৌন শোক মিছিল ঢাকা শহরের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলটিতে খালেদ মোশাররফের আত্মীয়-স্বজন অংশগ্রহণ করার ফলে জনমনে এবং সেনাবাহিনীর মাঝে এই ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে, খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে আওয়ামী বাকশাল রাজত্বের পুনরাগমন ঘটছে। এ থেকে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে, খন্দকার মোস্তাকের স্থলে প্রেসিডেন্ট পদে কোনো আওয়ামী লীগ নেতা বা কোনো রাজনৈতিক নেতাকে বসানোর বদলে খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন করেন।

প্রেসিডেন্ট মোস্তাক তার দায়িত্বভার প্রধান বিচারপতির কাছে হস্তান্তরের ইচ্ছা এক ঘোষণায় ৫ নভেম্বর প্রকাশ করেন। বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৬ নভেম্বর এবং এক ঘোষণাবলে জাতীয় সংসদ বাতিল

www.pathagar.com

করেন এবং ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেশে অবাধ সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানের পদে আসীন হলেও খালেদ মোশাররফের পক্ষে কোনো আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠা করা যখন আর মোটেও সম্ভব ছিল না, তখন তার সমর্থক ও রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের অনুসারী অধিকাংশ সেনাকর্মকর্তা তার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

খালেদ মোশাররফ এমনিভাবে দ্রুত সঙ্গী-সমর্থক হারা হয়ে পড়লে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরাটসংখ্যক সিপাহী ও অফিসারগণ মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ও পরবর্তীতে জাসদের প্রভাশালী নেতা কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে খালেদ মোশাররফ গ্রুপের উপর একটি সংগঠিত আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে ও তার কিছু সংখ্যক সাথীকে হত্যাকরত মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পুনরায় সেনাবাহিনীপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেন।

পরদিন (৭ নভেম্বর) ভোরে ঢাকার রাজপথে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবিসহ ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিক যান নিয়ে উৎফুল্ল সিপাহী ও জনতার মিছিলের ঢল নামে। ঐ দিন ভোরে এক সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট সায়েম ঐদিন রাতে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, তিনি প্রধান সামরিক আইনের প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোস্তাক আহমদকে এক সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে নির্দলীয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রধান বিচারপতি সায়েমের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের কথা জানান।

আরো উল্লেখ্য, ৬-৭ নভম্বরের উপরোক্ত ঘটনাবলীর পূর্বে সেনাবাহিনীর বিপ্লবী অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে ঢাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এ যোগাযোগ ছিল অতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং জনসাধারণের উদ্যম ও সাহসিকতায় ভরপুর। এই ছিল ৭ নভেম্বরের পটভূমি।

এক্ষেত্রে মন্তব্য প্রয়োজন যে, সিপাহী জনতার এই দেশপ্রেমিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের ঐক্য ও সংহতিই ছিল যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মূল শক্তি, তেমনি সেই একই সংহতির পুররুত্থান ঘটে ৭ নভেম্বর। এই পুনরুত্থান অনিবার্য, অত্যাবশ্যকীয় ছিল এ কারণে যে, ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর

www.pathagar.com

সিপাহী-জনতার মিলিত বিপ্লবী সংগ্রাম বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কালো মেঘমুক্তকরত করে সংরক্ষিত।

বলাবাহুল্য, ঐ ৭ নভেম্বর সংগ্রামী জনগণ ও সিপাহীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, বিপ্লবী ঘটনাসমূহের মধ্যদিয়ে জাতীয় সংহতি অর্জন না করলে বাংলাদেশ আঞ্চলিক আধিপত্যবাদীদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভারত ও পাকিস্তান যে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে সে পরিস্থিতিতে ভূ-রাজনৈতিক কারণেই ভারতের শাসকগোষ্ঠি বাংলাদেশের উপর বরাবর তাদের আধিপত্যবাদী থাবা উদ্যত করে রেখেছে।

উপমহাদেশের আঞ্চলিক রাজনীতির এ সত্য যারা চোখে দেখেও স্বীকার করে না, তারা প্রকৃতই জেগে ঘুমায় এবং তারা বাস্তবিক পক্ষেই আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের সেবায় নিয়োজিত। অন্য কথায়, যারা ৭ নভেম্বরকে 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' হিসেবে অস্বীকার করে, তারা আধিপত্যবাদের সেবাদাস হিসেবেই নিয়োজিত আছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ প্রতি ৭ নভেম্বর নতুন করে স্বাধীনতার শপথগ্রহণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে *(এখন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান)* পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকবাহিনীর এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানী বা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্য কোনো মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদ তার সরকারের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে যুদ্ধের অবসান হলো।

জেনারেল অরোরার কাছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটে। অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ তথা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। যেমন ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছিল। আর ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সাথে সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নবসৃষ্ট ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল। আর ব্রিটিশ সরকারই সরাসরি ভারত ও পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যই উপমহাদেশের জনগণ সেদিন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর পরই জেনারেল অরোরা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একজন সামরিক গভর্নর নিয়োগ করলেন। জেনারেল জগৎসিং সামরিক গভর্নরের দায়িত্ব পেলেন। সরকারের সকল মন্ত্রণালয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সকল জেলায় একজন করে ভারতীয় কর্মকর্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে ঢাকায় আনা হয়েছিল সম্ভবত ২৫ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরাজিত পাকিস্তানের হাত থেকে হস্তান্তরিত রাষ্ট্রক্ষমতা কাদের কাছে ছিল? প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং তাঁর সরকার যদি প্রকৃত ক্ষমতা পেয়ে থাকেন তবে কারা তাঁকে সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকেই প্রশ্নটি আছে এবং একটি বিভাজন রেখাও টেনে দিয়েছে। মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভারতে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশের মাটিতে পা রেখেই তিনি বলেছিলেন, একটি পুতুল সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এই শব্দ দুটি দেশে বহুল ব্যবহৃত। যাঁরা এ শব্দ দুটি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বদা ব্যবহার করেন তাঁরা দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে তারই মানদণ্ডে বিচার করতে চান। আমরাও চাই। চেতনাকে নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্যের রূপ দেয়া গেলেই কেবল তাকে বিচার মানদণ্ড হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" চেতনা বলি, লক্ষ্য বলি অথবা আদর্শ বলি সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে তার একটি নির্দিষ্ট রূপ পাওয়া যায়। আর তা হলো : ১। জাতীয় স্বাধীনতা, ২। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ৩। জনকল্যাণকর জাতীয় অর্থনীতি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই চেতনা, লক্ষ্য বা আদর্শের কী পরিণতি হয়েছিল তার সাক্ষী আমাদের ইতিহাস।

১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ থেকে সম্পদ ভারতে পাচার শুরু হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ও সমরসম্ভার ট্রাক বোঝাই করে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে যেতে শুরু করে।

আমাদের কলকারখানা থেকে মেশিনপত্র খুলে পাচার করা হতে থাকে। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা তার প্রতিবাদ করেন। এই নির্লজ্জ লুটপাট প্রতিরোধ করতে চাওয়ার অপরাধে মেজর জলিলকে কারারুদ্ধ হতে হয়।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। সে দিনই কুখ্যাত ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সই করেন। দশটি ধারা সম্বলিত এই চুক্তির ১নং ধারায় বলা হয়েছিল—চুক্তিভুক্ত দেশ দুটি কেউ কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পাশ্চিম অংশে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার জন্য 'বঙ্গসেনাদের' পোষা এই চুক্তির প্রতি ভারতের 'একান্ত' নিষ্ঠার পরিচয়। চুক্তিটির ৪ নং থেকে ১০ নং ধারা আরো প্রাসঙ্গিক। এই ধারাগুলো পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণে বাংলাদেশের অধিকার দিল্লীর নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলে। যে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের অধিকার অন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন তাকে কি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলা যায়?

www.pathagar.com

'৭৪ সালে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের কোনো স্থায়ী চুক্তি না করেই তদানীন্তন সরকার ফারাক্কা বাঁধ চালুর অনুমতি ভারতকে দিয়েছিলেন। আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে সেদিনের ভারত-সেবার নীতি কী বিষময় হয়ে দেখা দিয়েছে তা সবারই জানা। পানি এখন দিল্লীর হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র হয়েছে।

'৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ কয়েকটি বিদেশী কোম্পানির সাথে আমাদের উপসাগরীয় তেল অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি করেছিল। কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে অনুসন্ধান কাজ চালাবার আয়োজন যখন করছে তখন একদিন ভারতীয় নৌবাহিনী এসে তাদের সব স্থাপনা ভেঙেচুরে ফেলে। কোম্পানিগুলো পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। সেদিনের সরকার তার প্রতিকার তো দূরে থাক প্রতিবাদও করতে পারেন নি। তখন আমাদের কতটুকু স্বাধীনতা ছিল? সেদিনের সরকার কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন? সেটাই গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সেটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সরকার পরিবর্তন ও গঠনের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের। "আমার ভোট আমি দেবো, যারে খুশি তারে দেবো" একথাটি শেখ হাসিনা প্রায়ই বলেন। হ্যাঁ, যেখানে মানুষ নিঃশঙ্ক মনে এ অধিকার প্রয়োগের অধিকার ভোগ করেন সেটা গণতান্ত্রিক সমাজ। ভিন্ন মত পোষণ এবং প্রকাশের জন্য নাৎসী জার্মানির মতো যেখানে মানুষকে প্রাণ হারাতে হয় না সেটা গণতান্ত্রিক সমাজ। যেখানে সরকারপ্রধান বলেন, আপনার মত আমি সমর্থন না করলেও আপনার মতো প্রকাশের স্বাধীনতা আমি রক্ষা করব; সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

'৭২ থেকে '৭৫ সালের বাংলাদেশ কি এমন ছিল? '৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে অনেক ভালো কথা ছিল। কিন্তু সে-সব ভালো কথা যদি সে সংবিধানের প্রণেতারা বাস্তবে প্রয়োগ হতে দিতেন তবে তা গণতন্ত্র চর্চার একটি মর্যাদাবান দলিল হতে পারত। ভালো কথা যখন বাস্তবে কাজে লাগানো হয় না তখন তাকে আপত্য বাক্য বলে।

'৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল। ভোট গোনাই সম্ভব হয় নি। ব্যালট বাক্স লুট হয়ে গিয়েছিল।

'৭৩ সালে সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। অনেক নির্বাচনী এলাকায় বিরোধী দলীয় প্রার্থী মনোনয়নপত্রই দাখিল করতে পারেন নি। বিরোধী দলের বিজয়ী প্রার্থীকেও পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য হেলিকপ্টারে করে ব্যালটবাক্স ঢাকায় আনা হয়েছিল।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা নয়, ভিন্ন মতাবলম্বীদের গণতান্ত্রিক সহনশীলতা প্রদর্শন নয়। রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের নির্মূল করাই ছিল সেদিন রাষ্ট্রীয় নীতি। আর সেকাজে দলীয় পেটুয়া বাহিনীগুলোকে যথেষ্ট মনে হয় নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলের

www.pathagar.com

অধীনে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। ৩৭,০০০ মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে বর্বর হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হয়েছিল। সিরাজ শিকদার তাদের একজন। সিরাজ শিকদারের পিতা-মাতা বা নিহত দেশপ্রেমিকদের আত্মীয়-স্বজনরা বিচারের দাবি তুলতেও পারেন নি। দেশ জুড়ে সন্ত্রাস এমন বীভৎস আকার ধারণ করেছিল যে, নির্মল সেনকে লিখতে হয়েছিল, "স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই"। যে লক্ষাধিক রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তারা নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আরেক নাম ফ্যাসিবাদ।

'৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তবু সংবিধানের পাতায় গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা ছিল। সেদিন ছলনার শেষ নির্মোকটাও খুলে ফেলা হয়েছিল। নিজেদের প্রণীত সংবিধানকে ব্যবচ্ছেদ করে দেশের উপর, দেশবাসীর উপর একদলীয় স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সংবিধানের পাতায় যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো ছিল সেগুলোও নিহত হলো। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হলো। মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা হলো। সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হলো।

আদালতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করা হলো। যে সমাজে এমনটি ঘটে তা কি গণতান্ত্রিক সমাজ? যে রাষ্ট্রে এমনটি করে তা কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

'৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লীর লোকসভায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, উপমহাদেশে আজ এক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলো। এই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারতের অর্থনীতি পরিপূরক। আমাদের অর্থনীতি এবং ভারতের অর্থনীতি সেদিন পরিপূরক ছিল না আজও নয়। কিন্তু ম্যাজিকের মতো আমাদের সীমান্ত খুলে গেল। আমরা পেতে থাকলাম 'উলঙ্গ বাহার' শাড়ি। আর যেতে থাকল পাট, ধান, চাল, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র। জাল টাকায় আমাদের দেশ ছেয়ে গেল। আমাদের পাটকলগুলো বন্ধ হতে শুরু করল। আর পশ্চিম বাংলায় বন্ধ পাট কলগুলো কেবল চালুই হলো না, একরকম নতুন নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের পাটজাত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে মার খেতে শুরু করল। আর ভারতের পাটজাত পণ্য পেল রমরমা বাজার। পরিণতিতে দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষায়, আমাদের 'অর্থনীতি ফোকলা' হয়ে গেল। মাথায় সোনার মুকুট চড়িয়ে এদেশে যখন কেউ বিয়ে করছিলেন, ঠিক সেই সময় দুর্ভিক্ষের অভিশাপগ্রস্ত মানুষ ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্টের জন্য কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করেছে। না খেয়ে মরা মানুষের লাশ শিয়াল আর শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। সুন্দরতর জীবনের স্বপ্নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার আকাঙ্ক্ষার এ-কী মর্মান্তিক মৃত্যু।

স্বাধীনতার জন্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য, জনকল্যাণকর অর্থনীতির জন্য বাংলাদেশের সকল মানুষ সেদিন এই নারকীয় পরিস্থিতি এবং এই

www.pathagar.com

বিবেকহীন দুঃশাসন থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিত্রাণ এবং পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পথ সেদিন খোলা ছিল না। পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। ১৫ আগস্ট তাই এসেছিল অমোঘ নিয়তির মতো। জনগণের ইচ্ছাই সেদিন প্রতিফলিত হয়েছিল। সে পরিবর্তনের পিছনে ছিল সমগ্র জনগণের সম্মতি।

১৫ আগস্ট ঢাকায় শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। আর তাদের যারা ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন সেই দিল্লীশ্বর বা দিল্লীশ্বরীরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁদের সাজানো পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে এটা তাদের হিসেবের মধ্যে ছিল না।

'৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত যে ভূমিকা পালন করেছিল তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য সহায়ক ছিল। তাঁর জন্য তাদের প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা তা প্রকাশে আমাদের কোনো কুণ্ঠা নেই। কিন্তু একটি বাস্তবতা মনে রাখা ভালো। বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে নীতিগত সমর্থন, না তাদের ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, আবেগহীনভাবে তা বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ভারত কি কোনো দেশের কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে? ভিয়েতনাম সামরিক বলে কম্বোডিয়া দখল করেছিল। কম্বোডিয়ার জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল দেশ কম্বোডিয়ার জনগণের প্রতি সমর্থন ও সমহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত কম্বোডিয়ার জনগণের পক্ষে দাঁড়ায় নি। ভিয়েতনামকে সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করেছিল। সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ভারত আফগান জনগণকে নয়— সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করেছিল। একটি পুরানো প্রবাদ হলো, আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও। ভারতের অভ্যন্তরে অনেকগুলো জাতি এখন তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করছে। ১৯৭১ সালে যেমন আমরা করেছিলাম। কাশ্মির, পাঞ্জাব, আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজরাম প্রভৃতি রাজ্যের জনগণ তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চান। ভারত সামরিক শক্তি দিয়ে তাদের সংগ্রাম নস্যাৎ করতে চায়। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে পাকিস্তান করতে চেয়েছিল। এ কী কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি নীতিগত সমর্থনসূচক অবস্থানের প্রমাণ দেয়? ভারত ১৫ আগস্টের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে নি।

এ প্রসঙ্গেই ৩ নভেম্বর এসে পড়ে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশ সেদিন ১৫ আগস্টের সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বঙ্গভবনেও পৌঁছেছিলেন। খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং আদর্শগত অবস্থান

www.pathagar.com

কী ছিল? সারা দেশের মানুষ সেদিন এই কথাটি জানার জন্য উৎসুক ছিলেন। ৩ নভেম্বর সারাদিন গেল, খালেদ মোশাররফ কোনো কথা বললেন না। সেদিন রেডিও বাংলাদেশ বন্ধ ছিল। খালেদ মোশাররফের ক্যু'র প্রথম কাজটি ছিল সেনাবাহিনীপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি করা। জেনারেল জিয়াকে বন্দি করা এবং তাঁর নীরবতা সাধারণ মানুষকে সন্দিহান করে তুলছিল। জেনারেল জিয়ার দেশপ্রেম সম্পর্কে এদেশের মানুষের মনে কোনো সংশয় ছিল না। আর তাই যারা তাঁকে বন্দি করছে তাদের সম্পর্কে সন্দিহান হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

৪ নভেম্বর। বিকাল চারটা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় প্রায় ৫০০ লোকের জনসভা। সেখানে উপস্থিত প্রায় সকলেই চেনামুখ। মুহুর্মুহু জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান। একের পর এক বক্তা বক্তৃতা করছেন। তাদের দাবি ১৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাতে হবে। 'বঙ্গবন্ধু' নেই, সৈযদ নজরুল ইসলাম নেই তো কী হলো। স্পীকার আব্দুল মালেক উকিলকে প্রেসিডেন্ট বানানো হোক।

জনসভা শেষে মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা এবং বাকশাল সদস্য ভ্রাতা রাশেদ মোশাররফ। হাতে শেখ মুজিবের ছবি। খালেদ মোশাররফ নিজে কিছু তখন বলেন নি। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে দেশবাসীর সকল সন্দেহ ও সংশয় নিমেষেই কেটে গেল বাংলাদেশের মানুষ কোনো ছলে দেশকে আবার বাকশালী দুঃশাসনে ফিরিয়ে নেবার পক্ষে যে নয়— ৭ নভেম্বরে তারই বজ্র নির্মোঘ অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

১৫ আগস্টের ঘটনার পিছনে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র গণঅভ্যুত্থান যে অভ্যুত্থানের নায়ক সাধারণ মানুষ আর সাধারণ সৈনিক। বন্দি জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে তারাই তাঁকে জাতির নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। তারাই সেদিন নতুন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিঘোষিত করেছিলেন। ৩ নভেম্বর পুতুল সরকারের পুনরুত্থানের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৭ নভেম্বরের অবদানগুলো কী?

১। বাংলাদেশে আরেকবার আরেকটি পুতুল সরকার বসিয়ে দেবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়া।

২। জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করা।

৩। একদলীয় স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সেনা সদস্যদের আলিঙ্গন

ছবি : মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঢাকার রাজপথে বিপ্লবী সিপাহী-জনতার অভিনন্দন

ছবি : রশীদ তালুকদার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪। বাক, ব্যক্তি ও সংগঠন গড়ার অধিকারসহ সকল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণকে ফিরিয়ে দেয়া।

৫। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা এবং প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করা। এগুলো ৭ নভেম্বরের রাজনৈতিক অবদান।

৭ নভেম্বরের আরেকটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তা হলো আদর্শগত। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশী জনগণের জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ভিত্তি এবং প্রধান উপকরণ ৭ নভেম্বর এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চিহ্নিত করেছেন এবং আমাদের সংবিধানে স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মর্যাদাবান থাকাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রধান গ্যারান্টি।

এই সঠিক উপলব্ধি থেকেই প্রেসিডেন্ট জিয়া সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এই আয়াত সন্নিবেশিত এবং সংবিধানের ৮(১ক) ধারায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি'— এই নীতি প্রতিস্থাপন করেছিলেন। ৭ নভেম্বর তাই বাংলাদেশের জনগণের এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর গর্ব।

www.pathagar.com

আবদুল হাই শিকদার
স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫

আমাদের ইতিহাসে মাত্র দুবার ঘটেছিল সেই ঘটনাটি। ১৭৫৭ সালের পলাশী বিপর্যয় এবং ১৭৯৯ সালের শ্রীরঙ্গপত্তম পতনের যথাক্রমে ১০০ বছর ও ৫৮ বছর পর সারা উপমহাদেশব্যপী ঘটেছিল প্রথম ঘটনাটি। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে প্রথম ঘটনার ১১৮ বছর পর। সাদা ইতিহাসকারদের চোখে প্রথম ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। প্রাচ্যবিদরা বলছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সামগ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঘটনার সময় ১৮৫৭, সূচনাবিন্দু ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর। দ্বিতীয় ঘটনা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর, ঢাকা। ইতিহাসে এই অমর উপাখ্যান ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতা অভ্যুত্থান দিবস বা জাতীয় সংহতি ও বিপ্লবের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মাত্র এই দুবার আমাদের রাজনীতি, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনা অর্জন করেছিল ভিন্ন একটি মাত্রা। পেশাদার সৈনিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ, বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজের মতো, পদ্মার সঙ্গে যমুনার মতো একাকার হয়ে নেমে এসেছিল পথে।

আমাদের জাতীয় জীবনে উল্লেখ করার মতো দিনের অভাব নেই। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর ভুবন কাঁপানো গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে ভেজা অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান এবং সবশেষে '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান, পাশাপাশি মজনু শাহ্'র স্বাধীনতা যুদ্ধ, তিতুমীরের ওহাবী আন্দোলন, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী সংগ্রাম এবং দাউদ খান কররানী কিংবা ঈশা খাঁর আধিপত্যবাদী বিরোধী লড়াইও অনুল্লেখ্য কিছু নয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর বিপ্লবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অন্যান্য দিনগুলোর চাইতে আলাদা। বিষয়ের ভিতরে যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা, তা হয়তো অন্যান্য ঘটনাপঞ্জির পরিপূরক কিংবা সমগোত্রীয় ; কিন্তু আঙ্গিক আসলেই অন্য রকম। আরো যেটা অভিনিবেশ আকাঙ্ক্ষা করে তা হলো দুটি ঘটনার সূচনা হয়েছে একই বাংলাদেশ থেকে।

একটির আঁতুড়ঘর ব্যারাকপুর, অন্যটির ঢাকা। অবশ্য একটি ছড়িয়ে পড়ে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী, অন্যটির প্রাখর্য আবর্তিত হয়েছিল ৫৬ হাজার বর্গমাইলের যে শ্যামল কোমল সবুজ সমতল বাংলাদেশ, তাকে ঘিরে। প্রথম পক্ষের শত্রুরা এসেছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে। দ্বিতীয় পক্ষের শত্রুদের সাথে বাইরের যোগসাজশ থাকলেও তারা আধিপত্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষক। উভয় পক্ষ নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছে এমন কাউকে, যিনি সর্বজনমান্য। অসাম্প্রদায়িক চেতনার ক্ষেত্রেও উভয় ঘটনা সমান লালিত।

১৮৫৭ সালের সৈনিকরা সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার করণেই পারেনি

www.pathagar.com

ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে— এ-কথা বলেছি। কিন্তু ৭ নভেম্বরের সৈনিকরা বাঁধভাঙা, প্রবল, বিপুল, বিশাল, বিস্তৃত জনজোয়ারে হয়েছে মহিমান্বিত। প্রথম ধাক্কাতেই ৭ নভেম্বরের ক্ষেত্রে সৈনিক-জনতা দাঁড়িয়েছে এক কাতারে। ভেদাভেদহীন অনির্বচনীয় এক বিশ্বাস ও লক্ষ্যে তারা এগিয়ে এসেছে বিপ্লবের দিকে। নেতৃত্বের বিভ্রান্তির কারণে বার বার থমকে গেছে ১৮৫৭ সাল। ৭ নভেম্বরের বেলায় ছিল না এই সঙ্কট। ১৮৫৭ এর নেতা বখত খান, শাহজাদা মিরজা মুঘল, আজিমুল্লাহ খান, আহমদ শাহ, ফিরোজ শাহ্, তাতিয়া টোপী, নানা সাহেব, বেগম হযরত মহল, লক্ষ্মীবাঈ যেই হোন না কেন, সত্যিকার নেতা সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। যদিও তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। ৭ নভেম্বরের মূল চালিকাশক্তি জনতা ও সৈনিক। নেতা ছিলেন মাত্র একজন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক এবং তারুণ্যে উদ্বেল।

শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের এদেশীয় সেবাদাসদের হাতে পরাজিত হয় ১৮৫৭'র মহান সিপাহীরা। তাদের প্রাণ দিতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা ফাঁসির দড়িতে। কিন্তু ৭ নভেম্বরের পবিত্র অবয়বে কোথাও কোনো গ্লানির চিহ্ন নেই। অদ্ভুত সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত তার অঙ্গন। বিজয়ীর পালক তার শিরস্ত্রাণে।

১৮৫৭ সালের সাথে ৭ নভেম্বরের মিল-অমিলের প্রেক্ষাপট আলোক-সম্পাতের দাবি রাখে। সাধারণ সৈনিক, যাদের রাজা-উজির হওয়ার ইচ্ছে নেই, শুধু 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' স্বপ্নটুকু ছাড়া। তারা পরাধীনতায় পীড়িত বোধ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্ষোভ।

স্বশাসনের অনিবার্য অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে তুচ্ছ হয়েছে প্রাণ। সিপাহীরা অযোধ্যা, মিরাট, কানপুর, রোহিলাখণ্ড, ঝাঁসি, ফয়েজাবাদ, ব্যারাকপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, গোরখপুর, ফতেগড়, শাহবাদ থেকে ছুটে গেছে দিল্লীর দিকে। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সম্রাট হিসেবে বেছে নিয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লাল কিল্লার ওপরে। সাধারণ মানুষের অন্তর উদ্বেল হয়েছে, কিন্তু ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ তাদের ছিল না। তবুও সীমিত পর্যায়ে সৈনিক-জনতা এসেছিল একই প্রান্তিকে।

৭ নভেম্বরের সূচনাও সৈনিকদের হাত থেকেই। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মতো এই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ভাসমান ছিল না জনতার ওপর। বিচ্ছিন্ন কিংবা বিভক্ত ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই তার রং লাল। স্বপ্ন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। প্রথম পক্ষের লক্ষ্য স্বাধীনতা উদ্ধার, দ্বিতীয় পক্ষে রক্ষা। আধিপত্যবাদের হাত নভেম্বরের রণাঙ্গণে ভেঙে-গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সৈনিক-জনতা।

এ-সব মিল-অমিলের মধ্যেও আরো একটি দিক বিশেষ করে মনে রাখার মতো। ১৮৫৭ সালে সারা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে যখন দাবানলের মতো

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী। দিকে দিকে যখন দেশ মুক্তির মশাল নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে মুক্তি পাগল সিপাহীরা— সেই সময় সারা ভারতেই মাত্র একটি রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দূরে রেখেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে। শুধু দূরে রাখা নয়, সকল প্রকার রীতিনীতি, সভ্যতা, সুস্থতা ও লজ্জার মাথা খেয়ে 'বিশ্বস্ত ও বেতনভুক্ত সেবাদাসের' মতো উপমহাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরুদ্ধে নির্বিরাম চালিয়ে গেছে কলম— এরা বাংলার তথা কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এদের সময়কে 'বাংলার রেনেসাঁস' বলে অভিহিত করে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহকদের জানান হয় শ্রদ্ধা। বাংলার বুদ্ধিজীবীকুলের স্বভাব-চরিত্র শুরু থেকেই পদলেহনকারীর ও নিকৃষ্ট। স্বাধীনতার চাইতে পরাধীনতা, ব্যক্তিত্বের চাইতে মেরুদণ্ডহীনতা— সব সময়ই প্রশ্রয় পেয়েছে তাদের কাছে।

৭ নভেম্বরের বেলায়ও আমাদের বুদ্ধিজীবীমহলের বিরাট অংশ ঘটিয়েছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে অনুধাবন না করে উল্টা এই মহান ঘটনাটিকে কর্দমাক্ত করার জন্য তারা করে নি এহেন কাজ নেই এবং স্রেফ রাষ্ট্রঘাতী শক্তির তাঁবেদার হিসেবে এখনও ৭ নভেম্বরের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে অপতৎপরতা।

কিন্তু আমাদের দেশ ও স্বাধীনতার পরম সৌভাগ্য, আমাদের জনগণ কোনোসময়ই এই 'বিবেক বিক্রয়কারী বুদ্ধিজীবীদের' পাত্তা দেয় নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমাদের বীর জনতা এই বুদ্ধিজীবীদের গণনার মধ্যেই নেয়নি। নিলে যে দেশের সমূহ সর্বনাশ হতো, তা বলাই বাহুল্য।

শেষে আর একটা অমিলের কথা বলতেই হয়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করুক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা, তবুও সকল ভ্রুকুটিকে পাশ কাটিয়ে গেছে ইতিহাসবিদ, গবেষক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। তারা জাতিকে উপহার দিয়েছে শ' শ' গ্রন্থ, ইতিহাস, উপন্যাস, গবেষণা, গাথা ও গান। এক-দেড় শতাব্দী পরে বসে যদিও মনে হয় আরো গভীর পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন, তবু যা পেয়েছি, তা ধ্রুবতারকার মতো জ্বলজ্বলে ও অনির্বাণ। ৭ নভেম্বর নিয়ে তেমন কাজ আজও হয় নি। নভেম্বর নিয়ে ভাসা ভাসা আলোচনা পর্যালোচনা হলেও গভীরগ্রাহ্য গবেষণা আমরা পাই নি। ফলে এর তাৎপর্য ও গুরুত্বের সিংহভাগ রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করে ভুল করেছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীরা। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীদের ব্যর্থতার কারণেই ৭ নভেম্বর নিয়ে রচিত হয় নি প্রামাণ্য ইতিহাস, অগ্নিগর্ভ উপন্যাস, প্রাণস্পর্শী সংগীত। অথচ এই কাজগুলো করা অত্যন্ত জরুরি। ৭ নভেম্বরের চেতনাকে যদি জাতির প্রতিদিনের জীবনযাপনের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা না যায়, যদি অনায়াস অবলম্বন না হয় সংস্কৃতির, তাহলে মাঝেমধ্যেই আধিপত্যবাদের ধারক-বাহকরা ছড়াতে সুযোগ পাবে

www.pathagar.com

বিভ্রান্তির বাষ্প। যা জাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাসকে বার বার করবে ক্ষতাক্ত। আমাদের সবুজ সংসারে, পথে পথে বার বার তারা কাঁটা পুতে দেয়ার পাবে সুযোগ।

১৮৫৭ সালে পরাজিত বিধ্বস্ত দিল্লী দেখে কবি মির্জা গালিব আফসোস করেছেন এই বলে—

"আমার সম্মুখে দেখি বিস্তৃত উত্তাল রক্ত সমুদ্র
খোদা জানেন, আরো কত দেখতে হবে আমাকে।
শহীদ হল বন্ধু আমার হাজার হাজার,
কার মৃত্যুকে আমি রাখব মনে, আর কে
শুনবে আমার এ ফরিয়াদ ;
আমার মৃত্যুর পরে, কেউই থাকবে না হয়ত
দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলবার জন্য।"

আমরা এ রকম কোনো বেদনার মধ্যে পতিত হতে চাই না। সেজন্যই ৭ নভেম্বরের আনন্দ, স্বপ্ন, তাৎপর্য ও গুরুত্বকে নির্বিরাম চর্চা করতে হবে। ৭ নভেম্বরের বিজয়বাণীকে অঙ্গ করতে হবে জীবনের। আর এই কাজটি কেবল রাজনীতিবিদদের কাজ নয়, সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাতই নভেম্বর : যা ঘটেছিল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
৭ নভেম্বর যা ঘটেছিল

আজ ৭ নভেম্বর। সিপাহী-জনতার বিপ্লবের দিন। নানা দিক থেকে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনের ঘটনা পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

৭ নভেম্বরের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ দিনের গুরুত্ব আলোচনার সাথে সিপাহী-জনতার আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখার প্রয়োজন আছে। তাহলে ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব, বিশেষত্ব ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ বিপ্লবের প্রভাব অনুধাবন করা সহজ হবে।

১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের ফলে রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। খন্দকার মোস্তাকের সামরিক সরকার কতগুলো মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এগুলোর মধ্যে ছিল একদল বিলোপ, সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ সংশোধন, রক্ষীবাহিনী বাতিল এবং পিও ৯ (যার মাধ্যমে কোনো কারণ না দেখিয়েই যে-কোনো সরকারি কর্মচারিকে চাকুরিচ্যুত করা যেত) বাতিলকরণ। কিন্তু এ-সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তিনি তার রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করতে পারেন নি।

তিনি মাত্র ৮০ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। তরুণ সেনা অফিসার ফারুক, রশিদ, ডালিম এরাই ছিল বঙ্গভবনের মূল শক্তি। কিন্তু তারা যেহেতু সেনাবাহিনীর মূল ধারার বাইরে ছিল সেজন্য সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড না থাকায় অফিসারের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চেইন অব কমান্ড-এর মধ্যে অবশ্য একদল অফিসার ১৫ আগস্টের ঘটনা মেনে নিতে পারেন নাই। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ এসেও গেল।

৩ নভেম্বর সকালবেলা বাসা থেকে দেখলাম আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ছে। একটু অস্বাভাবিকই মনে হলো। একটু পরে প্রেসক্লাবে গিয়ে শুনলাম কাউন্টার ক্যু হয়েছে।

কে করলেন, কার কী অবস্থা কিছুই বোঝা গেল না সহজে। দুপুর নাগাদ শুনলাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে খন্দকার মুস্তাক ও ফারুক-রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সারা ঢাকা শহরে থমথমে ভাব। রেডিও টেলিভিশনেও কোনো খবর নেই।

দেশটা কে নিয়ন্ত্রণ করছে? পরদিন ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি মিছিল বের হলো আওয়ামী-বাকশালীদের নেতৃত্বে। ছাত্ররাও যোগ দিল। মিছিল চলল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে। আমি রিপোর্টার হিসেবে মিছিলটি অনুসরণ করলাম। হঠাৎ দেখি শিপিং করপোরেশনের জনসংযোগ

www.pathagar.com

ম্যানেজার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রকিব উদ্দিন বাচ্চু গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। তার গাড়িতে উঠে পড়লাম। ফলো করতে লাগলাম মিছিল। শেখ মুজিবের পক্ষে আওয়াজ উঠল।

মিছিল যখন ৩২ নম্বরের মাথায় তখন দেখলাম সাদা শাড়ি পরা এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধা রয়েছেন মিছিলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মা। কারা বিদ্রোহ করেছে, কী তাদের উদ্দেশ্য জনগণ বুঝে ফেললেন। আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা যোগ দিয়েছেন একথা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। গুঞ্জন উঠল— বাকশাল শাসন আবার ফিরে আসবে।

চার তারিখ সকালে শোনা গেল জেলখানায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর রহিম সাহেব অবজারভার থেকে আমার বাসায় ফোন করলেন। রাত তখন প্রায় ৯টা। তিনি আদেশ করলেন অফিসে যেতে। গেলাম।

তিনি বললেন, 'চলেন বঙ্গভবনে যাই। কি ঘটছে দেখি।' কিছুটা ভয় পেলাম। যাব কি যাব না ভাবছি। ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠে গেলাম। রহিম সাহেব খন্দকার মুস্তাকের প্রেস সেক্রেটারি তাজুল ইসলামের মাধ্যমে সব ঠিক করলেন।

রাত তখন ১০টা। বঙ্গভবনে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখা পেলাম কয়েকজন তরুণ সেনাঅফিসারের। তারা আমাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, সব স্বাভাবিক। আপনারা নির্ভয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বঙ্গভবনে আমরা কিন্তু একটা থমথমে ভাব লক্ষ করলাম। ঢুকেই বাঁ-দিকে দেখি সেনাবহিনীর অফিসার সব দাঁড়িয়ে।

এদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, নৌ-বাহিনীপ্রধান রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, বিমানবাহিনীপ্রধান তাওয়াব ও অন্যরা। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তাপটি টের পেলাম। শুনলাম উপরে কেবিনেট মিটিং চলছে। খুব হৈচৈ শোনা গেল। এম এইচ খান সাহেব খালেদ মোশাররফকে লক্ষ করে বললেন, "খালেদ, প্লিজ সেভ দ্য সিচুয়েশন।"

খালেদ মোশাররফ নির্বিকার দাঁড়িয়ে। তিনি কিছুই বললেন না। এরপর সময় দ্রুত বয়ে চলল। আমরা প্রেস সেক্রেটারির ঘরে বসলাম কী হয় শোনার জন্য। এমন সময় হঠাৎ দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল।

কে যেন বললেন, বঙ্গভবনের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। প্রেস সেক্রেটারির ঘরের দরোজা খুলতেই দেখা গেল ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ সেনাঅফিসার ও জওয়ানরা পজিশন নিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ! কে যেন বলল, কুমিল্লা থেকে খালেদ মোশাররফের বিরোধী সেনাদল আসছে। কিছু বুঝে উঠার আগেই

www.pathagar.com

তাজুল ইসলামের ডাক পড়ল। তিনি বাইরে গেলেন। ভেতরে আমরা তিনজন সাংবাদিক। রহিম সাহেব, গোলাম তাহাবুর এবং আমি। এ ছাড়াও রয়েছেন তদানীন্তন প্রধান তথ্য অফিসার সাংবাদিক মরহুম শামসুল হুদা এবং আরো কিছু সরকারি কর্মকর্তা।

তাজুল ইসলাম ফিরে এলেন। এসেই রেডিওতে ফোন করলেন। বললেন, এখনই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হবে। আমরা তখনো জানি না কী ঘটছে ওপর তলায়। তবে এটুকু দেখেছি কয়েকজন মন্ত্রী খুব নার্ভাস। কেবলই উপর-নিচ করছেন।

একজন তো তার একান্ত সচিবকে বললেন, "প্লিজ টেক কেয়ার অব মাই ফ্যামিলি।" তাজুল সাহেব আবার ওপরে. গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন একটি কাগজ হাতে করে। রেডিওতে খবরটি দিলেন। কাফী খানের কণ্ঠে ভেসে এল সে ঘোষণা।

ছোট্ট খবর, কিন্তু ৩ নভেম্বর থেকে যে অস্পষ্টতা শুরু হয় এ ঘোষণায় তার অবসান ঘটে। পরিষ্কার হলো, "ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করা হলো। আর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হলো।"

এই ঘোষণার সাথে সাথে বঙ্গভবনের পরিবেশ একটু হালকা বোধ হয়। সেনাবাহিনী যে পজিশন নিয়েছিল তা তুলে নেয়া হয়। রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান ও এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব খালেদ মোশাররফকে জেনারেলের ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। খুব খুশি তিনি।

এর মধ্যে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার কয়েকজন জওয়ানসহ প্রেস সেক্রেটারির ঘরে ঢুকলেন। সবার হাতে দু-তিনটি করে অস্ত্র। মেশিনগান, স্টেনগান, রিভলবার এ-সব। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। অফিসারটি ঘরে ঢুকেই একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

তিনি ইংরেজিতে বললেন, "You all are CSP officers. You please co-operate with us. We have brought about a change and ended politics of killing. We are taking care of the killer president Khandaker Mostaque. Four leaders have been killed in the Jail"

এ-কথা বলে তিনি আমাদের বললেন, "Follow me" মনে হলো সবাই যাচ্ছে। আমি পেছনের দিকে ছিলাম। আস্তে আস্তে বললাম, All are not CSP officers here. There are some journalists too. তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। একজনকে ইশারায় ডাকলেন। বললেন, "আসুন আমার সাথে"।

তিনি হলেন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী মোমেন উদ্দিন সাহেবের একান্ত সচিব জামাল উদ্দিন। তিনি গেলেন। মিনিট কয়েক পর ফিরে এলেন। খুব হাসি হাসি ভাব মুখে।

কিছুক্ষণ আগে মহাবিপদের সময় এই লোকটিই বাসায় ফোন করে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি খুব বিপদে আছি। মাকে দোয়া করতে বল।" এখন

www.pathagar.com

তিনি খুব খুশি আর চঞ্চল। তাজুল ইসলামকে একটা ফাইল দিতে বললেন। আমরা জানতে চাচ্ছিলাম কী ঘটেছে।

মনে হলো একটু আগের বিপদের সাথী জামাল সাহেব এখন আর আমাদের চেনেন না। আমাদের দিকে না তাকিয়েই বললেন, "I have been appointed private secretary to Gen. Khaled Mosharraf." যাহোক, তাকে বললাম, কি ভাই আমাদের যাওয়ার একটু ব্যবস্থা করতে পারেন কি? কোনো জবাব নেই।

গুঞ্জন শুনলাম, প্রধান বিচারপতিকে রাতেই বঙ্গভবনে আনা হবে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণ কারানো হবে। সব বড় অফিসারকে ডাকা হলো বঙ্গভবনে। আইজি প্রিজনকেও আনা হলো। ইতোমধ্যে জেল কিলিং তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। এরই মধ্যে গম্ভীর ও থমথমে মুখে ফিরে এলেন জামাল সাহেব।

বললাম, কী হলো ব্রাদার? তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "I have been dismissed" কেন? কারণ যে ঘোষণায় খালেদ মোশাররফ সাহেব জেনারেল এবং সেনাবাহিনীপ্রধান হলেন সেটির মূল কপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানুষের চরম বিপদের সময়ও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা মানুষকে সাহস যোগায়। আর হালকা করে দেয় ভীতিকর ভয়ংকর পরিবেশ। বঙ্গভবনে সেদিন তাই ঘটল।

একটা সময় মনে হয়েছিল তখনি ফায়ারিং শুরু হবে আর আমরা ক্রস ফায়ারিং-এ মারাই যাব। কিন্তু এখন রহিম সাহেব, জামাল সাহেব ও শামসুল হুদা সাহেবের হালকা রসিকতা আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিছুটা হলেও প্রশমিত করেছে।

পরের দিন প্রধান বিচারপতি সায়েম সাহেবকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হলো। একই সাথে তিনি হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ৫ তারিখ বিকাল বেলা তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। বঙ্গভবনে সবাই এলেন। সেখানে সবচেয়ে ব্যস্ত ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মি. সমর সেন। সমর সেন বাংলাদেশে খুব পরিচিত নাম।

কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি। তার কর্মব্যস্ততা গোটা পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে সন্দিহান করে তুলল। ৬ তারিখ সারা দিন খুব গুজব চলল। জিয়াউর রহমান কোথায় কেউ জানে না। তিনি কি বন্দি? ইতোমধ্যে ১৫ আগস্টের ঘটনার সাথে জড়িত অফিসারদের একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারা কোথায় যাবেন কেউ জানে না। পরে অবশ্য তারা লিবিয়ায় আশ্রয় নেন।

এদিকে ৬ তারিখ ভোর রাতের দিকে গুলির আওয়াজ আর শ্লোগান শোনা গেল। রাত প্রায় তিনটার দিকে আমার সিনিয়র সহকর্মী ফজলে রশিদ ফোন

www.pathagar.com

করলেন। তিনি থাকতেন নিউ মার্কেটের পূর্ব কোণে হোম ইকোনোমিক্স কলেজ সংলগ্ন ফ্লাটে।

ফোনে বললেন, নিউ মার্কেটের দিকে ট্রাক মিছিল যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ আর আল্লাহ আকবর ধ্বনি। এরপর এলো বন্ধু রকিবের ফোন। রেডিও শুনলাম। ভোর রাতের দিকে রেডিও চলল।

ভোরের দিকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব রেডিওতে বললেন, "আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি ..." ইত্যাদি ইত্যাদি। "আমি জিয়া বলছি" এটা একটা অস্ত্র ছিল জিয়াউর রহমানের হাতে।

১৯৭১ সালে কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তিনি একই ভাষায় স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দেন। সেদিন মেজর জিয়ার নাম সারা বাংলায় পরিচিত হয়ে যায় এবং তিনি জনগণের মনে একটা জনপ্রিয় স্থান করে নেন। সেই অস্ত্রই তিনি আবার ব্যবহার করলেন জাতির আরেক সঙ্কটকালে। সেদিন জিয়াউর রহমান না হলে গোটা পরিস্থিতিই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত এবং দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যেত।

এটা বেশি করে বুঝলাম রাস্তায় বেরিয়ে। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আমি ও ফজলে রশিদ অবজারভার অফিস থেকে মাইক্রোবাস নিয়ে রাস্তায় বেরুলাম কী ঘটছে দেখার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের কাছে গিয়ে দেখলাম রমনা পার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অসংখ্যা জনতার ভিড়। কে যেন চিৎকার করে বলল, ভারতীয় গুপ্তচর ধরা পড়েছে। এ সময় ১০/১২ জন সৈনিক লাফ দিয়ে আমাদের গাড়িতে ওঠে বসলেন। তাদের অস্ত্রগুলো মনে হলো নতুন, চকচক করছে। শাহবাগ হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা হলাম।

কারণ শুনলাম খালেদ মোশাররফসহ যাদেরকে বিপ্লবী সৈনিকরা হত্যা করেছে তাদের লাশ সিএমএইচএ আছে। শেরাটন হোটেলের (যা তখন ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম কয়েক ট্রাক সৈনিক মিছিল করছে।

তাদের হাতে খন্দকার মোস্তাক ও জিয়াউর রহমানের ছবি। রাইফেল, মেশিনগান শূন্যে উঁচিয়ে উন্নত মস্তকে তারা সারা শহর ঘুরছে। জনতা ট্যাংকের ওপর উঠে নাচছে আর আনন্দধ্বনি করছে।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সিপাহী-জনতার সম্মিলিত শক্তি সেদিন আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব পদানত করার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। যাহোক, আমরা ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে চললাম। সৈনিকরা দু-একটি কথা বলল আমাদের সাথে।

একজন বলল, 'দেখুন না, কি নতুন মেশিনগান। চিন থেকে এসেছে। আরো আসত। ষড়যন্ত্র করে জিয়াকে সরিয়ে দিয়ে এটা বন্ধ করতে চাইল কিছু লোক। আমরা তা নস্যাৎ করেছি।' ভয়ে ভয়ে এদের সাথে যাচ্ছি। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। জিয়ার পক্ষে আনন্দধ্বনি। পুরনো বিমানবন্দরে ক্যান্টনমেন্টে

www.pathagar.com

ঢোকার পথে যখন এলাম আমাদের গাড়ি আর যেতে দিল না। সৈন্যরা নেমে গেল। হঠাৎ লোকজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করল।

শোনা গেল ভারতীয় বিমান আসছে বিমানবন্দর আক্রমণ করতে। কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম আমি আর ফজলে রশিদ সাহেব। ড্রাইভার খালেক খুব সাহসী। সে বলল, স্যার উঠেন জলদি। আমরা গাড়িতে উঠলাম।

সে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রেসক্লাবে নিয়ে এলো। প্রেসক্লাবে শুনলাম অনেক কাহিনী। কীভাবে সব ঘটনা ঘটল। শোনা গেল কর্নেল তাহের হলো গোটা বিপ্লবের নায়ক। জাসদের শামসুদ্দিনের গলা শোনা গেল রেডিওতে। এ ছাড়াও প্রেসক্লাবে জাসদের নেতা-কর্মীদের অসম্ভব তৎপর মনে হলো। এদিকে খন্দকার মোস্তাক এবং জিয়াউর রহমানকেও রেডিও অফিসে আনার খবর এলো।

জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, কে এম ওবায়দুর রহমান এবং শাহ মোয়াজ্জেম যারা ৪ নভেম্বর রাতে বঙ্গভবন থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদেরকেও রেডিও অফিসে আনা হয়।

৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সিপাহী-জনতা মিলে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে এলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। সবার ধারণা ছিল মোস্তাক সাহেব আবার প্রেসিডেন্ট হবেন।

কিন্তু নাটকীয়ভাবে তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দিয়ে সায়েম সাহেবই প্রেসিডেন্ট থাকবেন বলে ঘোষণা করলেন। জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন। এটাই জিয়াউর রহমানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতারোহণ।

জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসলেন বিপ্লবের মাধ্যমে। জিয়া বিরোধীরা বলেন তিনি নাকি সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় আসেন। উপরের ঘটনা কি একথা বলে? মোটেই নয়। জিয়া সৈনিক হয়েও সেদিন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে এমন কিছু পদক্ষেপ নেন যা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। এমন কিছু মৌলিক পরিবর্তন করেন যাতে করে কোনো নির্বাচিত নেতা স্বৈরাচারী না হতে পারেন।

সর্বোপরি তিনি এদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সুসংগঠিত করে এদেশ স্বাধীনতা রক্ষার ব্যূহ তৈরি করেন।

জিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আজও গণতন্ত্র সুদৃঢ় করার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে— চলবে। ৭ নভেম্বর প্রেরণা যোগাবে এ সংগ্রামে।

www.pathagar.com

মনসুর আল মামুন

৭ নভেম্বর ও রেডিওর দুই নম্বর স্টুডিও

শাহবাগস্থ রেডিও বাংলাদেশের প্রচার কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যাওয়া প্রত্যেক পথচারীকে একবার অন্তত ওই রেডিও কেন্দ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতে দেখেছি। এখনো দেখি। কিন্তু কেন? এই প্রচারভবনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মানুষ রাহুমুক্ত হয়েছিল। এখান থেকে ইথারে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল স্বাধীনতা রক্ষার অমোঘ আহ্‌বান, সিপাহী জনতার দুর্বার ঐক্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ শহীদ জিয়ার কণ্ঠ থেকে। আমি তখন বার্তা বিভাগে কর্মরত।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সবই পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৫ আগস্ট ভোরে রেডিওর মেইনগেটের পাশে দেখা হয়েছিল আমার পূর্ব-পরিচিত আমারই জেলার এক মেজরের সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধে দুজনই অংশ নিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা এতবড় পরিবর্তন করে ফেললে কিন্তু ক্ষমতা কেড়ে নিলে না কেন? বলল, ওটা আমাদের দায়িত্ব নয়। স্বদেশবাসীর বৃহত্তর প্রয়োজনে আমরা শুধুমাত্র রাজনীতির মুক্ত চর্চার বাধা অপসারণ করেছি মাত্র।

আমার দীর্ঘদিনের সতীর্থ বীর প্রতীক উপাধিধারী ওই মেজরকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন তোমাদের কর্তব্য কী হবে? সংক্ষেপে সে বলল, আমরা ফিরে যাব ব্যারাকে, দেশ চালাবে রাজনীতিবিদরা।

ওর কথায় একজন পেশাদার সাংবাদিক হয়ে পুরো সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। বিশেষ করে যখন দেখলাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র সব দাবি 'মন্ত্রিসভায় এরা কারা, জবাব চাই'। 'গণবাহিনী গঠন কর' ইত্যাদি।

বুঝলাম কোথাও যেন কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই দেয়াল লিখনী ধানমণ্ডির ২ নম্বর রোডের পাশে ভারতীয় হাইকমিশনের ধারে দেখে সন্দেহ আরো ঘনিভূত হলো। আমি থাকতাম বাংলা মটরে। রেডিও অফিসে যেতাম পায়ে হেটেই।

তখন আমি ছিলাম ব্যাচেলর। তাই সংসারের কোনো ঝামেলা ছিল না। লোকমুখে তখন নানা কথা, শহরে নানা গুজব। এইসব নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপশি দেশের চিন্তা করার অবসর ছিল প্রচুর। তাই ইস্কাটন রোডের কফি হাউজে বসে আলাপ করতাম বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে।

নভেম্বর ঘনিয়ে আসতে আসতে অনেক ধরনের লিফলেটের ছড়াছড়ি শুরু হয়ে গেল। এগুলো পড়ি আর রেডিও অফিসে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে থাকি। রেডিও অফিসটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারটিও ছিলেন আমার জেলার,

www.pathagar.com

আর্টিলারির এক মেজর। কিন্তু ভদ্রলোক ছিলেন ভীষণ চাপা। নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে দেখলাম তিনি বিমর্ষ। পরে শুনলাম রুশপন্থী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন। তাকে নাকি সমর্থন দিচ্ছে ভারত। বুঝলাম রুশ-ভারত সমীকরণ হয়ে গেছে।

নভেম্বরের ১ থেকে ৭ অবধি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিলগ্ন পেরিয়ে গেল। রেডিও বাংলাদেশের শাহবাগস্থ বেতার ভবনের দুই নম্বর স্টুডিও এসবের নীরব সাক্ষী। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে ছিলাম। স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন হয় নি।

এ দুঃখ নিয়েও রেডিও বাংলাদেশে যোগ দেই। তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের রাজশাহী কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামে সাড়া দিয়ে পদ্মা পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম ফ্রন্টে। '৭৫-এর ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের পরও মনে নানা দ্বিধা, নানা দ্বন্দ্ব। বিশেষ করে সবই হচ্ছিল আমার শাহবাগ রেডিও কেন্দ্রকে ঘিরে। আরেকটু সংক্ষেপ করে বলতে হয় দুই নম্বর স্টুডিও দখলকে কেন্দ্র করে।

দেখলাম ভারতীয় গোয়েন্দা চক্রের পুনরায় ক্ষমতা দখলের পর পর দুটি প্রয়াস ভিন্ন কৌশলে। সারা দেশে তখন দারুণ বিশৃঙ্খলা। আমার সেই তরুণ মেজর যার স্বপ্ন ছিল দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হবে, তাকেও দেশত্যাগ করতে হলো। তবে যাবার সময় একটি ছোট চিরকুট পাঠিয়েছিল আমার কামরায়। ছোট্ট আকারে আশ্বাসবাণী। 'কমল আবারো আসবে চট্টগ্রামের মতো।'

আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। কবে আসবে কমল? দুই নম্বর স্টুডিওতে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও ৬ নভেম্বর রয়ে গেলাম রেডিও স্টেশনে। ওই রাতেই বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান রিং করলেন। জানতে চাইলেন রেডিও অফিস নিরাপদ তো? তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শুধু বললাম, "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত। বাংলাদেশ মুক্ত।" আশ্চর্য, ৭ নভেম্বর তার পত্রিকায় বিশেষ সম্পাদকীয়তেও এটিই ছিল শিরোনাম।

গভীর রাতে মুহুর্মুহু "নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর", "ভারতীয় চক্রান্তকারী নিপাত যাক", "সিপাহী জনতা এক হও" ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। মেজর জিয়াকে দেখলাম দুই নম্বর স্টুডিওতে। জীবনে এই প্রথম দেখলাম জিয়াকে।

সামান্যতম দুশ্চিন্তার চাপ নেই চেহারায়। তার প্রথম নির্দেশই ছিল, "সিপাহী ভায়েরা, তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমাদের আত্মত্যাগ ভুলবার নয়।" চেইন অব কমান্ড যা গত কয়েক দিন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল জিয়ার আবেগাপ্লুত রেডিও ভাষণে সেটি পুনঃস্থাপিত হয়ে গেল।

আজ ২৪ বছর পর ৭ নভেম্বর রেডিও বাংলাদেশে আমার দীর্ঘ জীবনের সেই রাত্রি আর সেই ভোরের কথা মনে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছে দুই নম্বর

www.pathagar.com

স্টুডিওর কাঁচের গ্লাসের ভেতর দিয়ে যেন আমি সেই জিয়াকে দেখছি, যিনি একদিন কালুরঘাটে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

'৭১-এর অগ্নিক্ষরা দিনে দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে দেশবাসী যখন বিভ্রান্ত তখন চট্টগ্রাম রেডিও থেকে জিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দেন। তারই ফলশ্রুতিতে আমাদের সেনাঅফিসার, সিপাহী ও জনতা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল।

'৭১-এ ইচ্ছা বা নিছক শখ করে নয়, জিয়াকে রেডিওতে আসতে হয়েছিল সঠিক নির্দেশ দিতে প্রয়োজনের তাগিদে। ঠিক ওই একই কারণেই ৭ নভেম্বর তিনি এসেছিলেন রেডিওর মাইক্রোফোনের কাছে ঢাকায়।

চার বছর পর জিয়ার পুনঃআবির্ভাব একের পর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। দেশ পর্যায়ক্রমে একদলীয় বাকশালী শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়েছে। আমার গর্ব, এ-সবই হয়েছে রেডিও বাংলাদেশের রাহুমুক্ত আবহাওয়ায়। প্রতি বছর ৭ নভেম্বর এলে তাই একবার যাই দুই নম্বর স্টুডিও দেখতে। আমার স্মৃতি রোমন্থন করতে।

www.pathagar.com

ড. খলিলুর রহমান

৭ নভেম্বর যেমন দেখেছি

১৯৭৫ সালের সারা বছরই ছিল ঘটনাবহুল। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ক্যু-হত্যা, ব্যর্থ-অভ্যুত্থান, সৈনিক-বিপ্লব, সিপাহী-জনতা একাত্মতা ঘোষণায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠাসহ জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সাক্ষী ১৯৭৫ সাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৭, '৫২, '৬৯, '৭১-এর মতোই '৭৫ একটি অবিস্মরণীয় সাল। সে বছরের ৭ নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের জনগণ ছিল যারপরনাই দুঃখদুর্দশায়, হতাশায় ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ; অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত। দেশের ভাগ্যাকাশ ছিল দুর্যোগের ঘনঘটায় মহা আচ্ছন্ন। ৭ নভেম্বর দেশকে এ-সব কিছু থেকে মুক্ত করেছে, অন্তত সেই সময়কালের বিচারে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের রেশ ১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধেও কাটে নি। সরকারি দমননীতি, অব্যবস্থা, একনায়কত্ব, বিলাসিতা তখন চরমে। বাকশালী শাসন কায়েমের সর্ব প্রক্রিয়া মহাসমারোহে চলেছে আর দেশের সর্ব-সাধারণের চোখের অশ্রু ঝরছে। মন তাদের বিষিয়ে ওঠেছে। আমি থাকতাম তখন কার্জন হল এলাকায়।

১৫ আগস্ট তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। শিক্ষকগণকে বাকশালে যোগদান করাবেন। সেই দিন প্রত্যুষেই ক্যু ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সে দিন দুপুর পর্যন্তও দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব রাস্তা দিয়ে তার বহরযাত্রা গমন করবে সে-সব রাস্তায় পুলিশ দণ্ডায়মান ছিলেন, যারা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন— কিন্তু সে পথে আর কোনোদিন তিনি যেতে পারেন নি। দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশগণ পরে চলে যায়। সেদিন রাস্তায় এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, সরকারপ্রধান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে কোনো মিছিল, বিক্ষোভ-সভা, শোকসভা কিছুই দেখা যায় নি।

তখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে কোনোই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। আওয়ামী লীগের নেতাই ক্ষমতা দখল করেন এবং আওয়ামী লীগেরই মন্ত্রিসভা বলতে গেলে গঠিত হয়— খন্দকার মোস্তাক আহমদের নেতৃত্বে। দেশে হঠাৎ করেই জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানি যেন কিছুটা কমে যায়। ফলে সাধারণ লোকজনের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে দুর্নীতি কমে যাওয়ায়। তবে আড়াই মাসের মাথায় ৩ নভেম্বর আবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে। মোস্তাক ক্ষমতাচ্যুত হন। প্রধান বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণ করাকালে টিভিতে

www.pathagar.com

দেখা যায় ও বুঝা যায়, তার বিমর্ষতা ও আনন্দহীনতা। বুঝাই যাচ্ছিল যে, তাঁকে জোর করে প্রেসিডেন্ট বানানো হচ্ছে। তখনকার সময় অনেকেই এই মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর ভাষণও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। দেশ আবার এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে নিপতিত হয়। সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে সপরিবারে জেনারেল খালেদ মোশাররফ গৃহবন্দি করেন। তিনি নির্দ্বিধায় প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

আর জেনারেল খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা দখলের ঘটনা প্রথম নাকি জানা যায় আকাশবাণীর খবরে। বাংলাদেশের আকাশ বাতাস আবার থমকে দাঁড়ায়। এদেশের গণতন্ত্রমনা জনগণ ও সেনা-সদস্যগণ, বিশেষ করে সাধারণ সৈনিকগণ জেনারেল খালেদ মোশাররফের ক্যু-কে মন থেকে গ্রহণ করেন নি। বিশেষ করে সেনাছাউনিতে চলে সারাক্ষণ গুঞ্জন ও উদ্যমহীনতা। তারা একত্রীভূত হতে থাকেন ও ঐক্য গড়ে তোলেন।

এর মধ্যে দেখা গেল, ৪ নভেম্বর, জেনারেল খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধ মাতা ও তার ভাই-এর নেতৃত্বে শহীদ মিনার ও ক্যাম্পাস এলাকায় মিছিল। জনগণ থমকে দাঁড়ায়। সেনা ছাউনিতে অসন্তোষ বেড়ে যায়। জনসাধারণ ও সৈনিকরা ৭ নভেম্বর প্রত্যুষে ঘটায় সিপাহী-জনতা বিপ্লব।

সেদিন প্রত্যুষেই জন-সোরগোল শোনা যায়, হৈ-হল্লার শব্দে কার্জন হল এলাকার সকলেই সচকিত হয়ে উঠে। দেশে হচ্ছেটা কি? কিছুটা ভীতিও ছিল। একটি জনতা-সৈনিক ভর্তি সশস্ত্র জীপ কার্জন হল এলাকায় এসে উৎসুক ছাত্র-জনতাকে আশ্বস্ত করে সংবাদ দিলেন যে, ৩ নভেম্বর সংঘটিত খালেদ মোশাররফের ক্যু ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ সৈনিকরা ব্যর্থ করে দিয়েছে। সৈনিকরা সবাই একত্র হয়ে দুর্গ ভেঙে বন্দি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে নেন। জোর করে আবার তাঁকে চীফ অব আর্মি স্টাফ বানানো হয়েছে।

সে দিন রাস্তায় ক্রমেই লোক বাড়তে থাকে। গাড়িতে, পায়ে হেঁটে, লোক রাস্তা দখল করে ফেলে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে গাড়িতে গাড়িতে ভর্তি করে হৈ-চৈ করে, আনন্দ-কোলাহল করে লোকজন-সৈনিকগণ রাস্তায় ফুর্তিতে মেতে উঠেন। সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

হাইকোর্ট রোড, প্রেসক্লাব রোড, কার্জন হল এলাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত এলাকা, শাহবাগ এলাকায় দেখেছি হর্ষোৎফুল্ল সেনা-জনতার অভিব্যক্তি। জনতা মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছেন— সিপাহী বিপ্লবের পক্ষে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে। সারাদিন জনগণ ও সেনা সদস্যগণ রাস্তায় রাস্তায় আনন্দ-উৎসব করে কাটান।

বিকেলে বা রাতে দেখা যায় অতি আনন্দ-চিত্তে প্রেসিডেন্ট সায়েম টিভিতে ভাষণ দিচ্ছেন। দেশে নব জাগরণের সূচনা হয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হয় সুসংহত। দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শক্তির হয় পরাজয়। আর ৭ নভেম্বরের

www.pathagar.com

সেনা-বিপ্লবের ফলেই প্রেসিডেন্ট জিয়াকে জোর করে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয় দেশের স্বার্থে। কোনরূপ মার্শাল ল' তিনি ডাকেন নি বা সংসদ তিনি ভাঙেন নি। বহুদলীয় গণতন্ত্র তিনি প্রবর্তন করেন, দেশের অর্থনীতির ভিত তিনি মজবুত করে গড়ে তোলেন। বাংলাদেশ এক বিরাট অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিরলস্ প্রচেষ্টা, সততা ও উদ্যোগের ফলেই।

৭ নভেম্বর সিপাহী-বিপ্লব হয়েছিল বলেই দেশ পেয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতো একজন দেশপ্রেমিক, উদার ও আদর্শবান জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে। তিনি জাতি গঠনে, এর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে, অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। খাল খনন করে, খেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি করে, কল-কারখানা, কুটির শিল্প. রাস্তা-ঘাট, পুকুর স্থাপন করে দেশের প্রভূত উন্নয়ন করেন। দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, নামকরণ, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকরণ তিনি বুঝতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রেসিডেন্ট জিয়া দুইটি ঐতিহাসিক কাজ করেছেন যার ফলে তিনি বাংলাদেশের লোকের হৃদয় জুড়ে আছেন, থাকবেন চিরদিন। প্রথমত, ২৫ মার্চ পাকিস্তানি আক্রমণের ফলে দিশেহারা জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে হতাশা থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধে সকলে সুশৃঙ্খলভাবে জড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, ৭ নভেম্বর তিনি ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন বলেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশ আগ্রাসন মুক্ত হয়েছিল।

প্রতি বছর বিএনপি ৭ নভেম্বরকে "জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস" হিসেবে পালন করে। কারণ এ দিনটির অনুপ্রেরণা আমাদের জাতীয় ঐক্যের রক্ষক ও স্বাধীনতা রক্ষা করার চেতনাদীপ্ত। ১৯৭৫ সালের পর থেকে দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত সিপাহী-জনতা অতি উৎসাহে, আনন্দ-উদ্দীপনায় বিপ্লব ও সংহতির প্রতীক হিসেবে ৭ নভেম্বর দিবসটি পালন করে থাকেন। এ দিনটি ছিল সরকারি ছুটির দিন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান সরকার দিনটির কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। উক্ত দিনটি যে সরকারি ছুটি দিবস ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ বিষয়টি মেনে নিতে পারে নি.। সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক কাজ ও ভূমিকাকে অস্বীকার করায় দেশের প্রকৃত ইতিহাসকেই অবজ্ঞা করা হয়েছে। এ ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

আজ বাংলাদেশের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা হলো জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা, সংহতি বজায় রাখা ও দৃঢ় মানসিক অবস্থান গ্রহণ করে দেশে যে-কোনো দুর্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়া। বিশেষ করে আধিপত্যবাদকে রুখে দেয়ার দায়িত্ব দেশপ্রেমিক জনগণের। আজ দেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে ও

www.pathagar.com

ভারত-তোষণ নীতির ফলে ভারত তার আগ্রাসী থাবা এদেশের ওপর বিস্তার করে চলেছে।

তাদের নীলনক্শা প্রণয়নের কাজ চলছে পুরো দেশে। গ্যারান্টি ক্লজবিহীন গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি, সার্বভৌমত্ব বিরোধী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ট্রানজিট-করিডোর প্রদানের পাঁয়তারা সবই করা হচ্ছে একতরফাভাবে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে। বাংলাদেশের স্বার্থ কোনোভাবেই রক্ষা হচ্ছে না।

সকল ক্ষেত্রেই আমরা চরমভাবে ভারতের কাছে মার খেয়ে চলেছি। অধুনা যুক্ত হয়েছে সীমান্ত এলাকা ভারত কর্তৃক দখলের নজিরবিহীন অপ-তৎপরতা। হাজার একর জমি তারা দখল করে নিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ এবং বেশ কিছু লোক বিএসএফ-এর গুলিতে মারা গেছেন।

দক্ষিণ তালপট্টিসহ অন্যান্য ছিটমহলগুলি নিয়ে যে সমস্যা তাদের সাথে জিইয়ে রাখা হয়েছে তা সমাধানকল্পে কোনো বাস্তব ও সদম্ভ পদক্ষেপ ও চাপ বাংলাদেশ সরকার ভারতের নিকট রাখতে পারছে না। আর এজন্যই দরকার ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতির চেতনাকে সমুন্নত রেখে দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করা।

www.pathagar.com

কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন

৭ নভেম্বর ছিল সিপাহী-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর আমাদের জাতিগত পরিচয় নির্দিষ্টকরণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহতকরণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত হিসেবে আমাদের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দেশের সাধারণ অরাজনৈতিক ভুক্তভোগী জনগণই এ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

আজকের আওয়ামী-বাকশালী সরকার একে অস্বীকার করলেও ইতিহাস একে অস্বীকার করবে না। সাধারণ জনগণ ও সিপাহীরা এ দিবসকে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মননে সব সময় লালন করবে।

৭ নভেম্বর এমন একটি ঘটনা, যে ঘটনা ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ইতিহাসে বহু বিপ্লব হয়েছে। সে-সব বিপ্লব পূর্ব থেকে পরিকল্পিত ছিল ও বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু ৭ নভেম্বর এমন এক ঘটনা, যা মাত্র ৪ দিনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্ববিহীন পূর্ব-পরিকল্পনা ব্যতীত প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্ফোরণ। কেউ যদি বলে কারো নেতৃত্বে ৭ নভেম্বরের বিপ্লব হয়েছে তবে তা ভুল হবে। জাসদের পক্ষ থেকে যদিও কর্নেল তাহেরের নাম বলা হয়। এ বিপ্লবে যেহেতু কোনো নেতৃত্ব ছিল না তাই সিপাহী-জনতা বন্দি অবস্থা থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে নেততে্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। কিন্তু সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সার্বেভৌম ছিল না। তাতে অংশীদারীর দাবি করা হতো। সে স্বাধীনতায় পররাষ্ট্রের তাঁবেদারিত্ব ছিল। আর ৭ নভেম্বরের বিপ্লব বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুসংহত করে।

সাধারণত দেখা যায়, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করলে বিশেষ একটি অংশের জনগণ সে সাথে থাকে। কিন্তু ৭ নভেম্বরের বিপ্লবে সিপাহী-জনতা একাকার হয়ে যায়। সামরিক বাহিনীর ট্যাংকে সিপাহীর সাথে ছিল জনতা।

৭ নভম্বরের বিপ্লবে মানুষের মনে যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ঘটেছে তা কিন্তু মাত্র ৪ দিনে দানা বাঁধে নি। স্বাধীনতার পর থেকেই কয়েকটি বিষয় সিপাহী-জনতাকে নিয়মিত শৃঙ্খলার বাঁধ ভেঙে এক জলোচ্ছ্বাসে পরিণত করে। তা হচ্ছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ বাংলাদেশের কাছে না করে ভারতের কাছে করা, বাংলাদেশ থেকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও মূল্যবান সামগ্রী ভারতে নিয়ে যাওয়া—— যার প্রতিবাদ মেজর জলিল করেছিলেন। সচিবালয় থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নেততে্ব রক্ষীবাহিনী গঠন করা, সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়-এর পরিণামে দুর্ভিক্ষ, সর্বোপরি একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল কয়েম

www.pathagar.com

করে গণতন্ত্র হত্যা, মিছিল-মিটিং ও সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে মানুষের নাগরিক অধিকার হরণ ইত্যাদি ৭ নভেম্বরের জন্য প্রত্যেকটি সিপাহী-জনতাকে প্রস্তুত করে। এ জন্যই '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মাত্র কয়েকজন সামরিক ও আওয়ামী লীগের একাংশের দ্বারা বাকশাল পতনের পর মনে হয়েছিল যে, সারা বাংলাদেশের মানুষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেছে। আওয়ামী লীগের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল সেদিন বলেছিলেন, বাংলাদেশে ফিরাউনের পতন হয়েছে।

খন্দকার মোস্তাকের তিন মাসের শাসনামলে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে দেশ চলেছে। কারণ মানুষ মনে করেছে, ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে মুক্তি পেয়ে দেশ সার্বভৌম হবে, রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার ও পুলিশের একাংশ এবং আওয়ামী সন্ত্রাসী লাল বাহিনীর নির্যাতন ও হত্যা থেকে মুক্তি পাবে। ধীরে ধীরে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। কিন্তু এরই মাঝে ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাশৃঙ্খলা রক্ষা করার নামে তখনকার সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাকের পতন ঘটায় ও মার্শাল ল' জারি করে।

খালেদ মোশাররফ অত্যন্ত সৎ ও স্বাধীনতার ঘোষক সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে নিজেই সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় এবং ঐদিনই ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসা থেকে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাইয়ের নেতৃত্বে কিছু বাকশালী কর্মীর মিছিল বের হওয়ায় সিপাহী-জনতা মনে করে, দেশ আবার '৭৫-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। এতে ৩ থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত জনতা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছিল আতঙ্কিত নিস্তব্ধতা। ৬ নভেম্বরের রাত শেষ হবার পর ৭ নভেম্বর শুরুতেই হঠাৎ করে সিপাহীরা 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে নিজ নিজ ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে। খালেদ মোশাররফ তার নিজের সাহায্যের জন্য রংপুর থেকে যে সামরিক বাহিনী এনেছিল তারাই সে রাতে খালেদ মোশাররফের পতন ঘটায়। ভোর হতেই জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকাসহ সারাদেশে রাস্তায় নেমে পড়ে এবং সিপাহীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

৭ নভেম্বর বিপ্লবের পর এ স্রোতকে নিজেদের দিকে নিয়ে যেতে অনেকে চেষ্টা করেছে। কর্নেল তাহের ও তার দিকে নিতে চেষ্টা করেছে। এতে এ বিপ্লবের মূল স্রোতের সাথে কর্নেল তাহেরের ক্ষুদ্র স্রোতের মতপার্থক্য দেখা দেয়। যেহেতু মূল স্রোত জিয়াউর রহমানকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জিয়ার সাথে তাহেরের মতপার্থক্য হয়েছে। আসলে এটা কোনো ব্যক্তিগত মতপার্থক্য নয়। এটা ছিল স্রোতের দ্বন্দ্ব। কর্নেল তাহেরের স্রোতের বক্তব্য ছিল— 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই' এবং ম্যানিফেস্টো ছিল শ্রেণীবিপ্লবের। অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যেই ছিল। কারণ কর্নেল তাহের ও মেজর জলিল উভয়ই ছিল অফিসার। এ বিষয়টি সেদিন ৮ নভেম্বর

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনীর নিজেদের মধ্যে উল্লেখিত হয়। তখনি শ্রেণীসংগ্রামের প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। আর বিজয়ী হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ন্যায়ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার অঙ্গীকার।

বাকশালীরা ৭ নভেম্বরকে 'সেনাহত্যা দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চায়। অথচ প্রকৃত অর্থে সেদিন ৭ ও ৮ তারিখে মাত্র ৪/৫ জন অফিসার নিহত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে অনেক অনেক বেশি প্রাণক্ষয় হয়েছে।

আজ ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে আওয়ামী-বাকশালী সরকার অস্বীকার করলেও ইতিহাস এ দিবসকে অস্বীকার করতে পারবে না। এ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সাধারণ সিপাহীরা। এ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের সাধারণ অরাজনৈতিক ভুক্তভোগী মানুষ। তারাই এ দিবসকে রক্ষা করবে, তাদের মধ্যে লালন করবে। বহু জিনিসই তো সরকারিভাবে করা হয়— যেমন সরকারি ভবনে শেখ মুজিবের ছবি উঠাতে এ সরকার বাধ্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে কজনে নিজে এ ছবি লাগিয়েছে? আজ এ সরকার জোর করে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস সরকারিভাবে পালন না করলেও জনতা-সিপাহী নিজের মননে, চিন্তা-চেতনায় এ দিবস পালন করবে।

www.pathagar.com

আমিনুর রহমান সরকার

সাত নভেম্বর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত সিপাহী জনতার বিপ্লব এই দেশ ও জাতির জন্যে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই বিপ্লব সমূহসঙ্কট থেকে কেবল আমাদের রক্ষা করে নি, জাতিগত গর্ব-গরিমা-অহঙ্কারকে বিপুলভাবে স্পর্ধিত করেছে। কারণ, এই ঘটনার প্রতি পরতে পরতে রয়েছে দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশী অপকৌশলের বিপরীতে জাতীয়তাবোধকে উজ্জীবিত ও শাণিত করার জীবন-মরণ প্রচেষ্টা। প্রমাণ হয়েছে, কোন ষড়যন্ত্র, কুটিলতা, আধিপত্যবাদী নীলনক্‌শা, আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে পারবে না; আমাদের সদাজাগ্রত সেনাবাহিনী এবং সচেতন জনসমাজ যে-কোনো রাষ্ট্র-বিরোধী ও গণবিরোধী অপতৎপরতা সময়মতো গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম।

১৫ আগস্টের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী অভ্যুত্থান, ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং তার পরপরই ঘটেছিল ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থান। বিপ্লবের আগে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান উচ্চালিভাষী সামরিক অফিসার খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিল গংদের হাতে বন্দি হন।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ শাফায়াত জমিল গংদের অভ্যুত্থানের পরই তার পক্ষে আকশবাণীর সাফাই এবং ঢাকার রাজপথে সংঘটিত আওয়ামী লীগের মিছিল অভ্যুত্থানটিকে ভারতপন্থীরূপে চিহ্নিত করে। ফলে দেশময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সেনাপ্রধানের বন্দিদশা সাধারণ সৈনিকদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

এই পটভূমিতে কর্নেল (অবঃ) তাহের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার বিপ্লবী অনুসারীদের সঠিকভাবে কাজে লাগান এবং ৬ নভেম্বর রাত ১২টায় অভ্যুত্থান শুরু করে মাত্র দেড় ঘণ্টায় তা সফল করে তোলেন। অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর নক্‌শাকার বা স্থপতি যেমন কর্নেল তাহের, তেমনি এর মূল বা প্রধান নেতা জিয়াউর রহমান।

তাহের অনুসারী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ছিল ৭০ থেকে ১০০ জন। তারা অনুঘটকের কাজ করেছিল। প্রচারপত্র ছড়িয়ে ও গোপনে ছোট ছোট সভা, অনুষ্ঠান করে তারা সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের অভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার সৈনিকের ৭৫ ভাগই ছিল জিয়ার অনুসারী, বাদবাকিরা ছিল ডালিম-ফারুক বা খন্দকার মোস্তাকের সমর্থক।

৭ নভেম্বর প্রত্যুষে সাধারণ সৈনিক ও জঙ্গী জনতার মিছিলে যে-সব শ্লোগান ধ্বনিত হয়, তা হচ্ছে: (১) নারায়ে তকবীর— আল্লাহু আকবর, (২) জিয়াউর রহমান জিয়াউর রহমান— জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, (৩) খন্দকার মোস্তাক,

www.pathagar.com

খন্দকার মোস্তাক— জিন্দাবাদ, (৪) রুশ-ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান, (৫) জিয়া জলিল তাহের তোমায়— লাল সালাম, লাল সালাম। এই শেষোক্ত শ্লোগানটি উচ্চারিত হয় তাহের অনুসারী তথা বিপ্লবী গণবাহিনী ও জাসদ-কর্মীদের মধ্যে। লক্ষণীয় যে, এই শ্লোগানেও জিয়াকে অগ্রভাগে রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে যে জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি ছিল আকাশচুম্বী এবং তিনিই যে ছিলেন বিপ্লবের প্রধান শক্তি এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয় ঘটনার দুই মহানায়ক জিয়া ও তাহেরের মধ্যে। রাত দেড়টায় খালেদ মোশাররফের জিন্দানখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহের উত্থাপিত ১২ দফা দাবির অনেকগুলো তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন। তিনি ঔপনিবেশিক যুগের ব্যাটম্যান প্রথা বাতিল করেন, রাজবন্দিদের মুক্তির নির্দেশ দেন।

কিন্তু তাহেরের লক্ষ্যের সাথে একমত হতে পারেন নি। তাহের চেয়েছিলেন জিয়ার নেতৃত্বে বামধারার লোকদের নিয়ে একটি বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল হোক এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর সৌধের ওপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠুক। এটি ছিল একটি শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেবার চিন্তা। পক্ষান্তরে জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন, বিভেদ নয় জাতিগত ঐক্য এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অংশীদারিত্বের মধ্যদিয়ে প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

এই রশি টানাটানিতে ধীর, স্থির, দূরদর্শী নেতা জিয়াউর রহমানই জয়যুক্ত হন। 'বিপ্লব হাত ছাড়া হয়ে গেছে মনে করে কর্নেল তাহের ও তার অনুসারীরা তখন জিয়াউর রহমানের নবগঠিত সরকারকে উৎখাত করতে নানামুখী তৎপরতা চালান।

একদিকে বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার তাগিদ, আরেকদিকে তাহের অনুসারীদের উসকিয়ে দেয়া নৈরাজ্যিক কার্যকলাপ— এ-সব সামাল দেবার জন্য জিয়াউর রহমানকে কঠোর হতে হয়। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কর্নেল তাহের ও তার অনুসারীরা কারাগারে নীত হোন এবং সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালে তাদের মৃত্যুদণ্ড ও মেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

আজ কেউ কেউ জিয়াউর রহমান ও কর্নেল তাহেরের চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ বলছেন, জিয়াউর রহমান ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ছিলেন। এই দুটো প্রচারণার কোনোটাই সত্যি নয়। গত দুই যুগের বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিস্থিতির নিরিখে এ সত্য আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে ওই সময় জিয়াউর রহমানের পথই সঠিক ছিল।

যে দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে নি এবং আধিপত্যবাদী শ্যেন দৃষ্টি যার সার্বভৌম ইচ্ছার বিকাশকে সর্বক্ষণ বাধাগ্রস্ত করে রাখে, সেখানে শ্রেণীভেদ নয়, জাতিগত ঐক্যই ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা। জিয়াউর রহমান ঠিক সময় ঠিক কাজটিই করেছিলেন, যা কর্নেল তাহের উপলব্ধিতে আনতে পারেন নি।

www.pathagar.com

কারণ, তিনি ভুল রাজনীতির ফাঁদে আটকে গিয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন চিনা ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একজন খাঁটি বিপ্লবী ও অসম সাহসী বীরযোদ্ধা। ৭ নভেম্বরের শ্লোগানগুলো থেকেই পরিষ্কার, অভ্যুত্থানটির প্রধান চরিত্র ছিল আধিপত্যবাদ ও আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী।

জিয়া এবং তাহের দুজনই ক্ষণজন্মা, ঐতিহাসিক পুরুষ। স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর জাতির সেই সঙ্কট-সন্ধিকালে এই দুই দেশপ্রেমিক, মহৎ ব্যক্তিত্বের চিন্তার সম্মিলন যদি না ঘটত, আধিপত্যবাদী শাসন-শোষণের যাঁতাকলে এই জাতির দুর্গতি যে-কোনো পর্যায়ে নেমে যেতো সচেতন প্রতিটি মানুষই তা আজ মানস-চোখে স্পষ্ট দেখতে পান। আর ওই মুহূর্তে জিয়াউর রহমান যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-মঞ্চে আবির্ভূত না হতেন, গণতান্ত্রিক স্বয়ম্ভরমুখী আধুনিক বাংলাদেশ আমরা কোনোদিন পেতাম কি না তা রীতিমতো সন্দেহের বিষয়।

এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে '৭৫-এর ৭ নভেম্বর-পরবর্তী হঠকারিতা, নৈরাজ্যিক ক্রিয়াকর্ম, যা ওই সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডরূপে চিহ্নিত হয়েছিল, তার সাথে কর্নেল তাহের সম্পৃক্ত থাকলেও বাস্তবিক পক্ষে জাসদ নেতৃত্বের পেটিবুর্জোয়া উন্মাদনা এবং ভ্রান্তিবিলাসই এজন্য দায়ী। বিপ্লবী তাহের পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন মাত্র।

অন্যদিকে জিয়াউর রহমান ভ্রান্তির চোরাবলি থেকে নিজেকে এবং জাতিকে সযত্নে রক্ষা করেছেন কারো পরামর্শে নয়, আপন বুদ্ধি-বিবেক-বিচক্ষণতা দিয়ে। এখানেই বীরযোদ্ধা জিয়াউর রহমান এবং বিপ্লবী তাহেরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

আজ ইতিহাসের দিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকালে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জিয়াউর রহমান ছিলেন এই ভূ-খণ্ডের জন্য পরম আশীর্বাদ। যখনি জাতির জীবনে সমূহ সঙ্কট, চরম দুর্যোগ, তখনি জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ত্রাণকর্তার মতো।

মওলানা ভাসানীর উদ্যোগ ও উদ্দীপনা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব গণঅভ্যুত্থান থেকে জাতির অন্তরে যখন স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানের জিন্দানখানায় স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করলেন সে সময়ের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতি সেই মুহূর্তে হালভাঙা তরীর মতো দিশেহারা, সংক্ষুব্ধ স্রোতাবর্তে নিপতিত। কিন্তু না, ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে শেখ মুজিবুর রহমান যখনি থেমে গেলেন, তার পরমুহূর্তেই অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রত্যুষে জাতির হাল ধরলেন জিয়াউর রহমান।

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিলেন, সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করলেন, মহাদুর্যোগ থেকে সাড়ে সাতকোটি মানুষকে রক্ষা করলেন। আবার

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আধিপত্যবাদী হিংস্র থাবা যখন আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করতে উদ্যত, অন্তরীণ দশা থেকেও জিয়াউর রহমান টেলিফোনযোগে বিপ্লবী বন্ধু তাহেরকে উদ্দীপ্ত করলেন। বিপ্লব সফল হলো। জাতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পর কর্নেল তাহের যেই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী, হঠকারী, নৈরাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়লেন, জিয়াউর রহমান সংযত হয়ে সুস্থির চিত্তে সমূহ অঘটন থেকে জাতিকে রক্ষা করলেন।

জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক বলয় থেকে ক্ষমতামঞ্চে আসেন নি। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক তিনি ছিলেন না। অথচ তিনি যে রাজনীতি, যে অর্থনীতি, শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন, সমগ্র জাতি তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করল, এ-ও এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

আরো বিস্ময়কর, যে বিপ্লবীরা বছরের পর বছর, দশকের পর দশক সমাজতন্ত্রের জন্য গোপনে প্রকাশ্যে লড়াই করলেন, রক্ত দিলেন, রক্ত নিলেন, তাদের অনেকেই জিয়াউর রহমানের রাজনীতিতে শামিল হলেন।

এমনকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 'লড়াকু পুরুষ'রাও জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবের মাত্র ক'বছরের মাথায় হাজার হাজার কর্মী-সংগঠকের আত্মদানের কথা ভুলে গিয়ে সমাজতন্ত্রের লাইন বিলোপ করলেন। মেতে উঠলেন তারা 'অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র', 'আরো গণতন্ত্র' ইত্যাদি শ্লোগান নিয়ে, যেগুলো শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতি নয়, শ্রেণী সমন্বয়ের রাজনীতি।

জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতন্ত্র আর শ্রেণী সমন্বয়মূলক রাজনীতির সাথে যার খুব একটা প্রভেদ নেই। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক না হয়েও জিয়াউর রহমান কীভাবে ওই সময়ে যুগোপযোগী, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

যারা মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে আসেন, তারা যে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার গুণেই ভালোমন্দ সঠিক-বেঠিক এর পার্থক্য নিরূপণ করে অগ্রসর হন, এ হচ্ছে তারই সার্থক দৃষ্টান্ত। স্মর্তব্য যে, জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবকালে গোটা বিশ্ব জুড়েই চলছিল সমাজতন্ত্রের সঙ্কটকাল। ১৯৭৬ ও '৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কস-লেনিনের ভলিউমের চেয়ে বাইবেল বিক্রি হয়েছিল বেশি।

অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট-দর্শনের বিপরীতে সোভিয়েত জনগণের মানসরাজ্যে চলছিল তুমুল এক তোলপাড়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাও থিতিয়ে এসে সোভিয়েত সমাজকে সঙ্কট-কবলিত করে তুলছিল। ওই সময় চিনের নতুন নেতা দেং জিয়াও পিং আত্মমুখী কম্যুনিস্ট অর্থনীতি এবং 'একলা চলো' বিদেশনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে 'ওপেন পলিসি' হাজির করেছেন।

www.pathagar.com

ইউরোপ-আমেরিকার প্রযুক্তি বিপ্লব গোটা বিশ্বকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তখন মার্কস-লেনিন-মাওয়ের দেয়া ধ্রুপদী পুঁজিবাদ নেই, ওই ধারার শ্রম-শোষণ বা শ্রেণী বৈষম্যও নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তবতাই বা থাকে কী করে।

এদিকে এশীয় ভূ-মণ্ডল এমনিতেই ধর্মীয় চেতনা অধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান। এখানে নাস্তিক্যবাদের ঠাঁই নেই। তার ওপর বাংলাদেশ নামক জনপদের সামাজিক জীবন গোড়া থেকেই পরস্পর সহযোগিতামূলক। এখানকার বিত্তশালীরা প্রায় সবাই 'মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া', ঠিকাদার এবং কমিশন ব্যবসায়ী।

মার্কস-লেনিনের সংজ্ঞায়িত শিল্পপতি বুর্জোয়া এখানে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, আদমজী-তেজগাঁওয়ের মিল-কারখানার একজন সাধারণ শ্রমিকেরও হয় দেশের বাড়িতে কয়েক কানি জমি আছে, নয়তো শহরে দোকানপাট আছে। অর্থাৎ মার্কস-লেনিন যাকে প্রোলেটারিয়েট বা সর্বহারা বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, সেই ধারার সর্বহারা এখানে নেই। শ্রেণী-বিভাজন, শ্রেণী-বিদ্বেষ যেখানে নেই, সেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম দানা বাঁধতে পারে না। মার্কস-লেলিনীয় কায়দায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও সেখানে অসম্ভব ব্যাপার।

এ-সব বাস্তবতা যাচাই না করে এদেশের বামপন্থীরা অন্ধভাবে মস্কো আর চিনের তত্ত্ব কচকচিয়ে বেহুদা রক্তক্ষয় করেছেন, হাজার হাজার মেধাবী তরুণের মাথা খেয়েছেন।

বেশুমার মানুষ মেরেছেন, অনর্থক সময় খরচ করে নিজেদের জীবন বরবাদ করেছেন। এরা সব রাশি রাশি মাথা, বস্তা বস্তা কাগজ নষ্ট করেছেন পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব শনাক্ত করার জন্য। অথচ এদেশে পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব কোনোদিনই প্রধান ছিল না। প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাথে স্বাধীন জনগোষ্ঠীর, যেটি জিয়াউর রহমান প্রথম শনাক্ত করেন এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে তা গণমুখী ধাঁচে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন।

বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিস্থিতির যে সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ও উত্থান এবং যেভাবে তিনি জাতিকে রক্ষা করে, রাজনীতি-অর্থনীতি, উন্নয়ন-উৎপাদন, শিক্ষা-প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী অভ্রান্ত দিক-নির্দেশনা দিলেন, তাতে তিনি যুগন্ধর পুরুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। জনপদের শত বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানের মহিমা ইতোমধ্যে অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

কাজী সিরাজ

৭ নভেম্বরের চেতনা অবিনাশী

৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে সংগ্রামে উদ্বেল, চেতনায় ভাস্বর একটা অনন্য দিন। এর তাৎপর্য অপরিসীম। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক দিবসটি ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সিপাহী-জনতার সম্মিলিত এই যুগান্তকারী অভ্যুত্থান দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ আবেদনকে ম্লান করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তারা সেই দিনের সরকারি ছুটি বাতিল করে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বোঝা গিয়েছিল যে, আধিপত্যবাদ বিরোধী চেতনার অনির্বাণ শিখা ৭ নভেম্বরকে তারা কালিমালিপ্ত করবে।

১৯৯৬ সালে স্বয়ং শেখ হাসিনা সিপাহী-জনতার এই অভ্যুত্থান দিবসকে 'মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস' হিসেবে চিত্রিত করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষ কখনোই বিদেশী আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে পরাভব মানে নি। শত অত্যাচার নিগ্রহের বিরুদ্ধে এই ভূখণ্ডে বার বার জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। আর এই চেতনাই একাত্তর সালে আমাদের সমগ্র জাতিকে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

আমাদের স্বাধীনতা সহজে আসে নি। এটা কারো দয়ার দান নয়। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে আমাদের লাখো যুব-তরুণের বুক চিরে খুন ঝরেছে, হাজারো মা-বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। অগণিত বাড়ি-ঘর, হাট-বাট বিরান হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরপরই আমাদেরকে পুনরায় পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাবার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। দুঃখ এখানে যে, যারা স্বাধীনতাযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক বলে নিজেদের এখনো জাহির করেন, সেই আওয়ামী লীগ হাত মেলায় আধিপত্যবাদী বৈরী প্রতিবেশী দেশের গভীর ষড়যন্ত্রের সাথে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়, শিল্পোৎপাদন লাটে ওঠে, কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়, বাংলাদেশ হয়ে যায় 'বাসকেট কেস'। জাতীয় প্রতিরক্ষা মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।

পাশাপাশি আধিপত্যবাদী শক্তির 'নীলনক্‌শা' বাস্তবায়নের সকল বাধা অপসারণের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর চলে জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস— প্রতিপক্ষ নির্মূলের ফ্যাসিবাদী অভিযান। তৎকালীন মুজিব সরকার

www.pathagar.com

কর্তৃক সিরাজ সিকদারসহ তেত্রিশ হাজার ভিন্নমতাবলম্বী হত্যার অভিযোগে এখনো বিরোধীপক্ষ সোচ্চার। সেদিনের ব্যকশালী একদলীয় স্বৈরাচারী এখনো শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে ত্রাস।

পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবের পতন এবং ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান এদেশের মানুষকে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার আনন্দ ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অপার গৌরবে মহীয়ান করে। ৭ নভেম্বর তাই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের স্পন্দন।

৭ নভেম্বর পূর্ব-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি-নির্ভর কোনো বিপ্লব ছিল না। বাংলাদেশকে বিদেশী তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ভিনদেশী চক্রান্ত ও তাদের এদেশীয় চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে তা ছিল তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ। আল্লাহর অশেষ রহমতে চক্রান্তকারী শক্তি সেদিন পরাজিত হয়েছে। আনন্দে উদ্বেল হয়েছে সমগ্র জাতি।

কিন্তু ৭ নভেম্বরের যে চেতনার আলোয় জাতি উদ্ভাসিত, তার বিরুদ্ধে এখন আবার গভীর চক্রান্ত চলছে। অপব্যাখ্যা আর গোয়েবলসীয় মিথ্যাচারের মাধ্যমে জাতির একটি গৌরবগাথাকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে সেদিনের ঐতিহাসিক বিপ্লবের পরাজিত শক্তি। তারা এখন ক্ষমতায়।

পঁচাত্তর সালের ৩ নভেম্বর তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান হয়েছিল। পতন হয়েছিল মোস্তাক সরকারের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খন্দকার মোস্তাক ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং ১৫ আগস্টের পর গঠিত তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ছিলেন ডাকসাইটে আওয়ামী লীগার।

তাদের সবাই শেখ মুজিব সরকারেরও মন্ত্রী ছিলেন। মুজিবের সাথে মোস্তাকের পার্থক্য ছিল— মোস্তাক আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন।

খালেদের অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগ ও তৎকালীন রুশ-ভারত অক্ষশক্তির এদেশীয় বশংবদদের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। আনন্দে আত্মহারা হয় তারা। এ প্রসঙ্গে এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস তাঁর 'বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে লিখেছেন:

"মোস্তাক আর মেজরদের উৎখাতের খবর শুনে আওয়ামী লীগার, ছাত্র ও মুজিব সমর্থিত দলগুলো রাস্তায় নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার তারা মুজিব দিবস হিসেবে পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শহীদ মিনারসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল বের হয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

. . . তারপর ৭ নভেম্বর শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশে শোকসভার

www.pathagar.com

আয়োজন করে। এ-সব কারণে জনগণের মনে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভ্যুত্থানের সূচনা করা হয় বলে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জনগণ মুজিব আমলের দুঃস্বপ্ন সবেমাত্র কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। উপরন্তু ফারাক্কা বাঁধের জন্য তাদের মধ্যে ভারতবিরোধী চেতনাও চরমে উঠেছিল।

সর্বোপরি তারা যখন আবিষ্কার করল: আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিচ্ছে, তখন তারা বুঝে নেয় যে, তার অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত আর আওয়ামী লীগ জড়িত— এতে কোনো সন্দেহ নেই। ... ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও সরকারি রেডিও প্রচারণায় খালেদ মোশাররফের গুণগানে মুখর হয়ে ওঠে।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অনেকটা বাকরুদ্ধ করে দেয়। পাকিস্তানি এককেন্দ্রিক, বিজাতীয় শাসক-শোষকদের শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসা স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ দিল্লির দাসত্ব মানতে রাজি নয়। এই চেতনা জনগণের মধ্যে শুধু নয়, ব্যারাকের সৈন্যদের মধেও চাঙা হয়ে ওঠে।

অথবা বলা যায়, ৭ নভেম্বর দেশের স্বাধীনতা সার্বেভৌমত্ব রক্ষায় সৈনিকদের সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপ সিপাহী-জনতাকে নিয়ে আসে এক কাতারে। দেশের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন থাকে আকাশে। জাতির সার্বভৌম অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল শক্তি স্তব্ধ হয়।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত ব্যর্থ অভ্যুত্থান শুধু ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতা বদলের উদ্দেশেই পরিচালিত হয়নি। সে অভ্যুত্থানের পেছনে কাজ করেছে এক গভীর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে এদেশকে বিদেশী করদরাজ্যে পরিণত করাই ছিল সে চক্রান্তের উদ্দেশ্য।

কিন্তু মীরজাফর-ঘসেটি বেগমদের মুখোশ সহসাই উন্মোচন করে ফেলে জনগণ। এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস তার 'বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে আরো বলেছেন, "একটি ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলই (আওয়ামী লীগ ছাড়া) একমত পোষণ করছিল এই বলে যে, খালেদ একজন বিশ্বাসঘাতক, ভারতের দালাল এবং সে সকলের ঘৃণিত বাকশাল আর মুজিববাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে"। (বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, পৃ. ১৮)।

ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সাথে আওয়ামী লীগ যুক্ত ছিল। আওয়ামী লীগ যুক্ত থাকলে উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, আওয়ামী লীগ শুদু ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা চায় না, তারা চায় এদেশে ভিনদেশী প্রভুর স্বার্থে তাদের প্রণীত 'নীলনকশা'র বাস্তবায়ন।

www.pathagar.com

৩ নভেম্বরের ব্যাপারে লীগ সরকার একুশ বছর পর প্রকাশ্যে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছে। ক্ষমতার তিন বছরে সরকারি দলের উদ্যোগে অনেক অনুষ্ঠানে সরকারি নেতা মন্ত্রীরা উপস্থিত হয়েছেন এবং অঝোরে কেঁদেছেন। জয়গান গেয়েছেন খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের।

গত বছর ৭ নভেম্বরেও সরকারি উদ্যোগ ও প্রচারণায় কিছু অনুষ্ঠান হয়েছে যা ছিল ৭ নভেম্বরের মৌল চেতনার বিরোধী। রেডিও-টিভির 'দাদাবাদী' সংস্কৃতির সেবকরাও ছিল বেশ অ্যাকটিভ। খালেদ মোশাররফকে নিয়ে আওয়ামী লীগের বাড়াবাড়ি থেকে খালেদের রাজনৈতিক পরিচয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জনগণের মধ্যে আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফকে আমি শ্রদ্ধা করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি নিজে যে সেক্টরে কাজ করেছি, সেই ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন তিনিই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কৃতিত্ব ও বীরত্বকে যারা স্বীকার করেন তাদের অধিকাংশই তার ৩ নভেম্বরের ভূমিকাকে স্বীকার করতে পারেন না।

আওয়ামী লীগ ও তাদের প্রভুরাষ্ট্রের সঙ্গে খালেদ মোশাররফের কোনো সম্পর্ক ছিল না বলে যারা প্রচার ও বিশ্বাস করতেন একুশ বছরে অনেকেরই সে বিভ্রান্তি কেটে গেছে। আওয়ামী লীগ ও সরকারের আচরণ তো বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। তবু আরেকটু ধারণার জন্য খালেদ সম্পর্কে অশোকা রায়নার লেখা 'ইনসাইডর' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদৃত করা যায়।

"কর্নেল মেননের ('র'-এর তৎকালীন যুগ্ম-পরিচালক ও পাকিস্তান শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত এস শংকর নায়ারের ছদ্মনাম) অবিরাম ভ্রমণ এবং যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী 'র'-এর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র খোলা হয় এবং 'কর্নেল মেননের' সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ওই সমস্ত তরুণ, অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। এভাবে ভ্রমণের ফলে 'স্থানীয় কেন্দ্র প্রধান' নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা হয়।

এ সমস্ত কেন্দ্র প্রধানদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর (যিনি পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন) নেতৃত্বাধীন মেজর খালেদ মোশাররফ (পূর্বে একজন সামরিক স্টাফ অফিসার ব্রিগেডিয়ার মেজর), মেজর শফিউল্লাহ ও আবুদল কাদের সিদ্দিকী যিনি বাঘা সিদ্দিকী ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীরও 'র' এজেন্টদের মধ্যে যোগাযোগকারীরূপে আবির্ভূত হন" (অনুবাদ গ্রন্থ, পৃ. ৬২)। এরপর খালেদ সম্পর্কে আর কোনো বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়। নভেম্বর '৭৫ খালেদের পরিচালিত অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যও এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

অভ্যুত্থানের পরপর খালেদ মোশাররফ তার ক্ষমতাকে সংহত করার কাজ

www.pathagar.com

শুরু করেন। আগস্ট অভ্যুত্থানের মেজর গ্রুপের সঙ্গে তার একটা সমঝোতা হয় এবং ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, পাশাসহ ১৭ জনের একটি দল ফারুক, রশীদের সঙ্গে প্রবাসে চলে যায়।

এরপর খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল হন এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এমজি তোয়াব আর নৌ-বাহিনীপ্রধান কমোডোর এম.এইচ খান খালেদের কাঁধে জেনারেলের স্টার এবং ফিতা পরিয়ে দেন। বাংলাদেশ অবজার্ভারের প্রথম পাতায় ছবিটি ছাপা হয়েছিল।

খালেদ মোশাররফ তৎকালীন সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল জিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের উল্লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে ... "সে যাই হোক জীবনের হুমকির মুখে জিয়ার কাছ থেকে ইস্তফা আদায় করা হয়েছিল বলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়।

কারণ তিনি ইস্তফা দেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে বন্দি অবস্থায় সময় কাটাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে একদল সেনা পাঠানো হয় জেনারেল জিয়াকে আটক করার জন্য। তারা তাঁর বাড়িকে সকল যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জিয়াকে তাঁর হল ঘরে আটকে রাখে।

৬ নভেম্বর দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এএসএম সায়েম শপথ গ্রহণ করেন। তিনি যখন খালেদের অভ্যুত্থান ও তাঁর নিজের উদ্দেশ্য বাখ্যা দানে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ই পরিস্থিতি প্রতি বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মহান সিপাহী বিদ্রোহীদের দাবানল ইতিমধ্যেই জ্বলে ওঠে।" (বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ, এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস পৃষ্ঠা- ১০৫, ১০৬, ১১৪)।

খালেদ মোশাররফের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। একজন 'বীর'ও যখন ভুল করেন, হিংসা, লোভ আর উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে চক্রান্তকারীর পাতা ফাঁদে পা ফেলেন, জনগণ তাকেও খড়কুটোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ৭ নভেম্বরে সে নিয়তিই অপেক্ষা করছিল খালেদ মোশাররফের জন্য।

ব্যারাকের সিপাহী, বাইরের জনতা সবাই পর্দার আড়ালের খেলা বুঝে ফেলে। ৬ নভেম্বরের মধ্যরাতের পরই সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সিপাহী বিদ্রোহ প্রথমে একটা বিপজ্জনক পথে বাক নিচ্ছিল। কর্নেল (অবঃ) তাহেরের নেতৃত্বে গড়া জাসদ সমর্থিত 'বিপ্লবী সৈনিক সংঘ' বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন— "এই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কা লাগে ১০ জন শ্লোগান তোলে- 'সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।" ম্যাসকারেনহাস তাঁর বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "এই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কা লাগে ১০ জন তরুণ আর্মি অফিসারের ওপর। ওরা তখন দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ব্যারাকের কাছে একটি অফিসার্স মেসে অবস্থান করছিল।

অফিসারদের একজন ব্যাটম্যান এই সময় বারান্দা দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে 'জীবন নিয়ে পালান, সিপাহীরা আপনাদের খুন করতে আসছে।

www.pathagar.com

অফিসাররা আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে সাদা পোশাকে মেসের পেছন দিকের দেয়াল টপকে চলে আসেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের পেছনে ধানক্ষেতে। ওই অফিসারদের একজন ছিল বেগম জিয়ার ছোট ভাই সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সাঈদ ইস্কান্দার।" সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানকালে জাসদের ভূমিকা এবং সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড নষ্ট করার উদ্যোগটি ছিল ঘটনার অন্য একটি কালো অধ্যায়।

৭ নভেম্বর সকাল বেলায় সৈনিকরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাজপথে হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে অভিনন্দন জানায়। দেশপ্রেম ও স্বদেশ চেতনার ঐক্য কীভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে ৭ নভেম্বর তার প্রমাণ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সকলে। যে মানুষ ৪টি দিন ছিল বাকরুদ্ধ, বিপন্ন, স্বাধীনতা নিয়ে উৎকণ্ঠিত, তাদের কণ্ঠেই বুলন্দ আওয়াজ উঠল— নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

সিপাহী-জনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কোনো প্রকার নেতৃত্ব ছাড়াই ঘটে গেল এক মহান বিপ্লব। বিপ্লবীরাই ঐক্যবদ্ধভাবে জেনারেল জিয়াকে বেছে নিল দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে। ইতিহাসে এ এক নতুন শিক্ষা।

এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের বক্তব্য আবারো উল্লেখ করতে চাই। তিনি লিখেছেন, "উল্লসিত কিছু সৈনিক আর বেসামরিক লোক নিয়ে কতগুলো ট্যাংক ঢাকা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়। এবার ওই ট্যাংক দেখে লোকজন ভয়ে না পালিয়ে ট্যাংকের সৈনিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

চারদিন ধরে তারা মনে করেছিল যে, খালেদ মোশাররফকে দিয়ে ভারত তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খর্ব করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এতক্ষণে তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেল।

জনতা সৈনিকদের দেশের ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দিত করল। সর্বত্রই জোয়ান আর সাধারণ মানুষ খুশিতে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি শুরু করে। রাস্তায় নেমে রাতভর তারা শ্লোগান দিতে থাকে— আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ ইত্যাদি।

অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণের মত জনমত আবার জেগে উঠেছে। এটা ছিল সত্যিই একটি স্মরণীয় দিন।" লীগ সরকার এই ৭ নভেম্বরের ভয় পায়।

কারণ, তাদের হাতে পায়ে আধিপত্যবাদী শক্তির দাসত্বের শৃঙ্খল আর ৭ নভেম্বর হচ্ছে সভ্যতা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের শাশ্বত নিশান। ওরা আমাদের স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতার ঝাণ্ডাকে কলঙ্কিত করে আমাদের জাতীয় অহংকারকে গুড়িয়ে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত।

www.pathagar.com

এক অপশক্তি আর ৭ নভেম্বর ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, পাহাড়ি-অপাহাড়ি নির্বিশেষে 'স্টেট ন্যাশনালিজমের' সকল উপাদান সমৃদ্ধ অনেক ফুলের গাঁথা একটি মালা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোয় উদ্ভাসিত এক প্রদীপ্ত সূর্য।

সিপাহী-জনতার যে মহান বিপ্লব দেশ এবং জাতিকে আধিপত্যবাদী শক্তির দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে, জাতীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন দশা থেকে উদ্ধার করেছে, সেই মহান বিপ্লব ও বিপ্লবী সিপাহী-জনতার গৌরব গাথাকে ম্লান করার লীগ প্রয়াস জনগণ রুখবেই।

www.pathagar.com

ড. আবদুল লতিফ মাসুম
পঁচাত্তরের নভেম্বরে যা ঘটেছিল

স্থান বঙ্গভবন। তারিখ ২ নভেম্বর, ১৯৭৫। সময় রাত ১২-৩০টা। কর্নেল রশিদ ঘুমোতে যাচ্ছেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ অফিসার। স্যার! সর্বনাশ হয়েছে। বঙ্গভবনে প্রহরারত সৈন্যরা চলে যাচ্ছে। সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আর সবাইও চলে যেতে চাচ্ছে। কর্নেল রশিদ বুঝলেন সঙ্কট শুরু হয়েছে। কদিন ধরে যে বারুদের গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে তা নাকে ঢুকছে। রহস্যাবৃত '৭৫-এর নভেম্বর-এর সঙ্কটময় দিনগুলোর শুরুটা এরকম।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকেই সেনানিবাস ও ঢাকা শহরে জোর গুজব রটেছিল একটা কিছু হতে যাচ্ছে। খোদ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমদও জানতেন একটা কিছু হতে যাচ্ছে। (Anthony Mascaranhas, Bangladesh : A Legacy of Blood, পৃ ঃ ৯০) কিন্তু ঘটনার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মোটামুটিভাবে সেনাবাহিনী বনাম বঙ্গভবন স্নায়ুযুদ্ধের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল।

১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীর কারণে সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব তথা নিয়ন্ত্রণের সঙ্কট দেখা দেয়। একটি সফল অভ্যুত্থানের স্বাভাবিক অনিবার্যতায় সেনাবাহিনীর 'চেইন অফ কামন্ড' ভেঙে পড়ে। আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবনে স্থান নেন। তারা সেখান থেকে সফলভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেও সেনাবাহিনীর সাথে সঙ্গত কারণেই বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা মেজরদের এই আচরণকে 'মেজর জেনারেলের' আচরণের মত মনে করেন।

সিনিয়ররা চাচ্ছিলেন মেজররা সেনানিবাসে ফিরে এসে তাদের কমান্ড মেনে চলুক। কিন্তু রশিদ-ফারুকরা নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষমতা গ্রহণের উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সেনানিবাসে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। ৬ জন ক্যু নেতা তাদের ট্যাঙ্ক বহর ও সেনাসামন্ত নিয়ে বঙ্গভবন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। অপরদিকে সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) খালেদ মোশাররফ এবং ঢাকা ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিল সেনানিবাস নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এই দুই সিনিয়র অফিসার প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, তারা এক দেশে দুই সেনাবাহিনী এই অবস্থাকে কোনোক্রমেই মেনে নেবে না। খালেদ ও জামিল রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়ে আগস্ট বিপ্লবকে মেনে নিতে পারেন নি। খালেদ ছিলেন অনেক সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আর শাফায়াত জামিলের 'হট হেডেড' বলে বদনাম ছিল *(পরবর্তী ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ মেলে)*।

www.pathagar.com

বিবদমান এ দু'পক্ষের মাঝে অবস্থান করছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী এবং সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান। জাতির এই দুজন অভিভাবকই চাইতেন দু'পক্ষের সমঝোতা। তাই কোনো গ্রুপকে বিরূপ করতে পারে এরকম কার্যব্যবস্থা গ্রহণে তারা উভয়ই বিরত ছিলেন। জিয়া তার উত্তরাধিকার এবং আচরণের কারণেই উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

সেনাসংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষতা বা সমদূরত্ব বজায় রাখেন। পরবর্তীকালে তার এ ভারসাম্যের কারণে উভয় পক্ষের অনাস্থার সম্মুখীন হন। জেনারেল ওসমানীও প্রায়ই একই অবস্থার সম্মুখীন হন। তবে ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন। ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে কিছুটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে। পরস্পর অবিশ্বাস, সন্দেহ, হানাহানি চরমে ওঠে। শান্তি সম্প্রীতির পরিবর্তে হিংসা ও শত্রুতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩ নভেম্বরের ক্যু

২ নভেম্বর গভীর রাতে পাল্টা অভ্যুত্থান প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতোমধ্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গভবন থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে খন্দকার মোস্তাকের সাথে ক্যুর নেতারা সলাপরামর্শে বসেন। কর্নেল ফারুক চাইলেন বিমান বন্দর, ঢাকা সেনাসদর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে। ধীরস্থির মানুষ কর্নেল রশিদ রক্তপাত এড়িয়ে সঙ্কটমুক্তির কথা বললেন। খন্দকার মোস্তাকও আপস-রফার পরামর্শ দিলেন। কর্নেল ফারুক ত্বরিত গতিতে তিনটি কাজ করলেন :

(১) বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ,
(২) ব্যক্তিগতভাবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত ট্যাঙ্ক বহরের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং
(৩) বঙ্গভবনে অবস্থানরত ট্যাঙ্কগুলোকে প্রধান ফটকের বাইরে ডিফেন্সিভ অবস্থানে স্থাপন।

এদিকে কর্নেল রশিদ সেনাবাহিনীপ্রধান জিয়াকে ফোন করলেন। জিয়া তখন ঘুমে। বেগম জিয়া তাকে ডেকে তুললেন। কর্নেল রশিদ জিয়াকে তখনি বঙ্গভবনে আসার অনুরোধ জানালেন। জিয়া এবারও মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে বিচ্যুত হলেন না। তিনি বঙ্গভবনে না এসে কর্নেল রশিদকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন। তারপর কর্নেল রশিদ খালেদ মোশাররফকে ফোন করলেন। খালেদ মোশাররফ তাকে বললেন, যা প্রত্যাশিত তাই হচ্ছে। তিনি রশিদের সাথে ফোনে আলাপ সংক্ষিপ্ত করলেন। তারপর বিপদাপন্ন মেজররা একে একে অনেককে ফোন করলেন।

www.pathagar.com

বিডিআর, এয়ার চীফ, নেভি চীফ সবাই তাদের হতাশ করলেন। কিন্তু কেউ না এলেও সেনাবাহিনীর ঐক্যের প্রতিভূ ওসমানী এলেন। তিনি এসেই জিয়াকে ফোন করলেন। ততক্ষণে জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওসমানী খালেদকে ফোন করলেন। খবর পাওয়া গেল খালেদ মোশাররফ ক্যু-এর নেতৃত্ব স্বহস্তে পরিচালনা করছেন। কর্নেল শাফায়াত জামিল প্রধান মিত্র হিসেবে তার সাথে রয়েছেন।

ইতোমধ্যে পাল্টা অভ্যুত্থানকারীরা বেতার, টিভি, এয়ারপোর্ট, টেলিফোন ভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখলে নিয়ে আসে। জিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করে। একটি গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি অত্যাসন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এমনি এক পরিস্থিতিতে রাত ৩টার পরে খালেদ নিজে রশিদকে ফোনে 'নরম-গরম' কথা বলেন। রশিদ আপসের সাথে কথা না বলে মোকাবেলার কথা বলেন। ভোর হওয়ার আগেই শাফায়াত জামিলের ৪৬ ব্রিগেড বঙ্গভবন ঘেরাও করে। সেখানে এক নিদারুণ ভীতিজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। রশিদ নিজেই ট্যাঙ্কবাহিনীর তদারকী করছিলেন।

বঙ্গভবনে যখন এই ভীতিজনক অবস্থা তখন কেন্দ্রীয় কারাগারে আরো ভীতিজনক ঘটনা ঘটে যায়। আওয়ামী লীগের চার নেতা তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিহত হন। পাল্টা অভ্যুত্থানকারীরা এই চার নেতা বিশেষত তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে ভারতের সহায়তায় পাল্টা সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন এমন একটি গুজবের প্রেক্ষিতে চার নেতা নিহত হন। (সূত্র: *Lawrence Lifschultz : Bangladesh : The Unfinished Revolution*)।

৩ নভেম্বর সকাল হতে না হতেই পরিস্থিতি আরো গরম হয়ে ওঠে। বিমান বাহিনীপ্রধান তোয়াবের নির্দেশে *(তোয়াবকে সেপ্টেম্বরে রশিদরাই বিমান বাহিনীপ্রধান নিয়োগ করেন)* দুটো মিগ বঙ্গভবনে বোমা বর্ষণের মহড়া দেয়। খন্দকার মোস্তাক ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে আশ্রয় নেন। জেনারেল ওসমানী উস্কানির মুখে সবাইকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ জানান। সকালের দিকে খালেদ মোশাররফের পক্ষ থেকে একটি ছোট প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে এসে হাজির হন। এদের মধ্যে ছিলেন দুজন কর্নেল। খালেদ মোশাররফের দাবি ছিল ৩টি—

(১) ট্যাঙ্ক বহরকে সেনানিবাসে ফেরত দিতে হবে।

(২) জিয়ার বদলে একজন নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ করতে হবে।

(৩) খন্দকার মোস্তাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকবেন। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিকালীন বন্ধু দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রাখতে হবে *(স্পষ্টত: ভারত এবং রাশিয়ার কথা বলা হয়েছে)*।

খন্দকার মোস্তাক দাবিসমূহ অগ্রাহ্য করেন এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তার পদত্যাগ সকাল ৬টা থেকে কার্যকর হবে বলেও তিনি ঐ প্রতিনিধিদলকে

www.pathagar.com

জানিয়ে দেন। দুঘণ্টা পর প্রতিনিধিদল আবার ফিরে আসে। তারা এবার তৃতীয় দাবিটি উহ্য রাখে। ট্যাঙ্ক প্রত্যাহারের চেয়েও তারা একজন নতুন সেনাবাহিনীপ্রধান নিয়োগের জন্য চাপ প্রয়োগ করে, কিন্তু প্রতিনিধিদলের কেউই খালেদ মোশাররফের নাম প্রস্তাব করেনি।

খন্দকার মোস্তাক আবার একই কথা বলেন। তিনি যেহেতু প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদত্যাগ করেছেন, সুতরাং তিনি কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না। জেনারেল ওসমানীকে প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে জানালে তিনি ক্ষেপে যান। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করায় স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে কার্যকারিতার অবসান ঘটেছে। বৃদ্ধ জেনারেল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এবং বলেন, "তোমরা গোল্লায় যাও, যা ইচ্ছা তাই করো, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না" এর পরেও কয়েক ঘণ্টা ধরে ঐ লোকেরা বঙ্গভবন-সেনানিবাস দৌড়াদৌড়ি করেন। কিন্তু তাদের দূতিয়ালী ব্যর্থ হয়।

রশিদ অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। অনেক টানাপোড়েনের পরে মেজর হাফিজের মধ্যস্থতায় একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয়, মোস্তাকের অনুরোধে উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে আগস্ট ক্যু-নেতারা বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে যাবেন। সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয়সহ সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।

বিমান বাহিনীর প্রধান এম জি তোয়াবকে এ-সব নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিন তারিখ মাগরিবের ওয়াক্তে আগস্ট ক্যু-এর নেতৃবৃন্দ তাদের পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশ বিমানের একটি বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে বঙ্গভবনে খন্দকার মোস্তাক তার নিজ বাসভবনে যাওয়ার জন্য তৈরি হন।

খালেদ মোশাররফ তাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। সবার অনুরোধে মোস্তাক রাজি হন। তিনি দুটো শর্ত দেন। ১৫ আগস্টের পরে যেমন তিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনী তার প্রতি অনুগত থাকতে হবে, এবারও তেমনই বললেন। আরো বললেন মন্ত্রিসভাকে খোলামেলা আলাপ আলোচনার পর তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

খালেদ মোশাররফ দুটো শর্তই মেনে নেন। তার পরদিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর সকাল ১০ টায় মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক আহূত হয়। ২৬ সদস্যের কেবিনেট বঙ্গভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কেবিনেট রুমে বৈঠকে বসে জেলহত্যার তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেন। মন্ত্রীদের অনেকেরই কথাবার্তায় নতুন সুর। তারা প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাককে হত্যাকারীদের বিদেশ যেতে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। মন্ত্রিসভা খালেদ, জেনারেল খলিল, তোয়াব এবং কমোডর খানকেও জিজ্ঞাসা করে।

www.pathagar.com

আকস্মিক ঘটনা

মন্ত্রিসভা যখন এমনতর অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিল তখন ঘটে সেই নাটক। যা ঘটনাবলীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আকস্মিকভাবে সজোরে দরোজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। হাতে সেনাসুলভ বেতের ছড়ি। সাথে স্টেনগানসহ ৫ জন অফিসার। এতে মন্ত্রীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। মন্ত্রীরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করেন। একজন খন্দকার মোস্তাকের মাথায় স্টেনগান ঠেকায়। ওসমানীর হস্তক্ষেপে মোস্তাক বেঁচে যান।

শাফায়াত জামিল খন্দকার মোস্তাককে জাতির পিতার হত্যাকারী, চার নেতার হত্যাকারী এবং মীরজাফর ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেন। তিনি তার পদত্যাগ দাবি করেন। ওসমানীও মোস্তাককে পদত্যাগের পরামর্শ দেন। মোস্তাক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। মোস্তাক লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন। শাফায়াত জামিলরা মোস্তাককে দিয়ে আরো দু-একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিয়ে রাখেন। এবার শাফায়াত জামিল প্রস্তাব করেন, প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন। মন্ত্রিসভার কে একজন পরামর্শ দেন— প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট উভয়ই মৃত। সুতরাং, সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা স্পীকারের কাছেই হস্তান্তরিত হওয়া উচিত। এতে শাফায়াত জামিল রেগে যান এবং তার কথামত দুজন করিৎকর্মা মন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জেম এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে ঐদিন গ্রেফতার করা হয়।

৫ নভেম্বর সায়েম প্রেসিডেন্ট

প্রধান বিচারপতি আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েমকে ৫ নভেম্বর বেলা একটার সময় বঙ্গভবনে নিয়ে আসা হয়। ওসমানী তাকে সুসংবাদটি দিলে তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন। অবশেষে অনুরোধে ঢেঁকি গেলেন। তার সম্মতির ভিত্তিতে পরদিন অর্থাৎ ৬ নভেম্বর তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত চার বছরে দেশের ৫ম প্রেসিডেন্ট হলেন সায়েম, ৬ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

ক্যু : রাজনৈতিক চরিত্র

৩ নভেম্বরের ক্যু-কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু ঘটনা ঘটে। রুশ-ভারতপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলো ৪ নভেম্বর মুজিব দিবস হিসেবে পালন করেন। তারা ঢাকা শহরে মুজিব স্মরণে শোক মিছিল বের করেন। একটি মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধ মাতা এবং ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ এমপি। দেশের ডান-বাম সব রাজনৈতিক শক্তিই ৩ নভেম্বর ক্যু-কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী পরিস্থিতি

১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ক্যু-কে সাধারণ সৈনিকরা অফিসারদের ফায়দা হাসিলের কারসাজি হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সময়কালে তদানীন্তন সরকারের সেনাবাহিনীর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণে সৈনিকরা ছিল ক্ষুব্ধ।

তারা খালেদের ক্যু-কে ভারতপন্থী বলে মনে করে একে রুখে দাঁড়াতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। জাসদ-এর নেতৃত্বাধীন সৈনিকদের সংগঠন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' খালেদ মোশাররফের ক্যু-কে প্রো-ইন্ডিয়ান ক্যু-বলে অভিহিত করে।

তারা খালেদকে অপসারণের আহ্বান জানিয়ে ক্যান্টনমেন্টে লিফলেট বিতরণ করে। এ-সব লিফলেট সৈনিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কর্নেল শাফয়াত জামিল ৪৬ ইনফ্যান্ট্রী ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করা সত্ত্বেও নিজেকে নিরাপদবোধ করছিলেন না।

তিনি ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সার এবং রশিদের ২নং ফিল্ড আর্টিলারীকে অস্ত্রহীন অবস্থাও বিপজ্জনক মনে করেছিলেন। তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি রংপুর থেকে ১০ম এবং ১৫শো ইস্ট বেঙ্গলকে ডেকে পাঠান কিন্তু এ দুটো রেজিমেন্ট সময়মত ঢাকা আসতে ব্যর্থ হয়। মুজিব হত্যার সাথে জড়িত এবং অন্যান্য সাধারণ সৈনিকরা শাফায়াত জামিলকে বদরাগী ও কঠোর বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

পক্ষান্তরে জিয়াউর রহমান সৈনিকদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তার গ্রেফতার সৈনিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ছিলেন সৈনিকদের কাছে পিতৃপুরুষতুল্য।

নানা কারণে খন্দকার মোস্তাকও সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। দেশ পরিচালনায় এ-সব নেতার অনুপস্থিতি সৈনিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে দেয়।

বিপ্লবের প্রস্তুতি

কর্নেল তাহের তখন অসুস্থ ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের বাসায় ছিলেন তিনি। তিনি বলেন, '৩ তারিখ ভোর ৪টায় আমি একটি টেলিফোন কল পাই। অপর প্রান্তে ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি তার হাউস এরেস্ট হওয়ার কথা আমাকে জানালেন। সাহায্য চাইলেন।

এরপর টেলিফোন লাইন কেটে গেল। ঐদিন বেশকিছু এনসিও এবং জেসিও আমার বাসায় আসে। তারা জানায়, খালেদের ক্যু-এর পিছনে ভারত আছে। বাকশালীরা আবার ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে। তারা আরো জানায়, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অন্যান্য কোর ট্রুপস-এর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

যে-কোনো সময় গুলি শুরু হতে পারে। (Col. Taher : last Testament) তাহের এ-সব সৈনিকদের কাজে লাগান। সৈনিকদের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৬ নভেম্বর সন্ধ্যারাতে যে-কোনো নির্দেশের জন্য সৈনিকরা প্রস্তুত থাকবে। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১ টায় বিপ্লব শুরু হবে। বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ :

(ক) খালেদ মোশাররফদের অপসারণ,
(খ) জিয়াউর রহমানের মুক্তি,
(গ) বিপ্লবী সৈনিক কমান্ড কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা,
(ঘ) দল-মত নির্বশেষে সকল বন্দির মুক্তি,
(ঙ) সর্বদলীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা (বাকশাল বাদে),
(চ) বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা বাস্তবায়ন।

(সূত্র : *Lawrence Lifschultsz : the Unfinished Revolution*, পৃ. ৯০)।

৭ নভেম্বর : দিনলিপি

রাত ১টা। ঢাকা সেনানিবাস। পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত সৈনিক ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্র গুদাম ভেঙে অফিসারদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সৈনিকরা মিছিলে হাজির হয়। তাদের মুখে শ্লোগান ছিল 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর", "সিপাহী-জনতা এক হয়েছে, এক হয়েছে", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" "জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ", "খন্দকার মোস্তাক জিন্দাবাদ।"

তারা কিছু ক্ষতিকর শ্লোগানও দেয়। যেমন : সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই, সুবেদারের উপরে অফিসার নাই ইত্যাদি। তারা রেডিও স্টেশন, টিভি, টেলিফোন ভবন, পোস্ট অফিস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

রাত ৩টা। তারা অবরুদ্ধ জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারী সদর দপ্তরে জিয়াকে কাঁধে করে নিয়ে আসে সৈনিকরা। সৈনিকরা আনন্দ আপ্লুতভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে। অসংখ্য সৈনিক তাকে ফুলের মালা দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। তাকে কাঁধে নিয়ে নাচতে থাকে।

জিয়া তখনো নাইটড্রেসে ছিলেন। জিয়া মুক্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে তাহের সেখানে পৌছান। জিয়া আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেন। সৈনিকরা জিয়াকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করলে জিয়া তা তাহেরকে দিয়ে বলেন, এগুলো তাহের ভাইকেই মানায়।

রাত ৪টা। তাহের গ্রুপের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক জিয়াকে রেডিও ভাষণের নামে শহরে নিয়ে আসার একটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে রাত

www.pathagar.com

দেড়টা নাগাদ সিপাহী-বিপ্লবের খবর বেতার মারফত দেশবাসীর কাছে পৌঁছে গেছে। জিয়াকে ঐসব ঘোষণায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জিয়া এ সময় বেতারে একটি ছোট ভাষণ দেন। *(ভাষণটি সেনানিবাসে রেকর্ড করা হয়)*। ভাষণ নিম্নরূপ :

আমি জিয়া বলছি :

"প্রিয় দেশবাসী, আচ্ছালামু আলাইকুম। আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল'ল এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

এ দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে অফিস আদালত, যানবাহন, বিমানবন্দর, নৌ-বন্দর ও কল-কারখানাগুলো পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।"

খালেদ মোশাররফের কথা

সিপাহী-বিপ্লবের কথা খালেদ প্রথম জানতে পারেন ৬ তারিখ রাতে। চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে তাকে এ খবর দেয়া হয়। খালেদ বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন আগে থেকেই।

এর আগের দিন তিনি তার স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনকে অজ্ঞাত নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। রাত ১১-৩০টায় খালেদ শাফায়াত জামিলকে সাথে নিয়ে বঙ্গভবনে আসেন। সেখানে শীর্ষ পর্যায়ের একটি বৈঠক নির্ধারিত ছিল। বিপ্লবের খবর পেয়ে খালেদ বঙ্গভবনেই থেকে যান। পরে বিপদ বুঝে খালেদ তার নিজস্ব কারে কর্নেল হুদা, কর্নেল হায়দারসহ শেরেবাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ম ইস্টবেঙ্গল সদর দফতরের দিকে রওয়ানা হন। পথে ফাতিমা নার্সিং হোম-এর কাছাকাছি এলে কারটি বিকল হয়ে যায়।

খালেদ নার্সিং হোমে প্রবেশ করে একটি ফোন করেন। ওদিক থেকে 'ওকে' সিগন্যাল পান। তারা তিনজন ১০ম ইস্ট বেঙ্গলে উপস্থিত হন ও সেখানেই রাত কাটান।

৭ নভেম্বর সকালের দিকে বিপ্লবী সিপাহীরা ১০ম ইস্ট বেঙ্গলে যায়। তারা সিপাহীদের যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। দ্রুত সিপাহীরা মত পাল্টে ফেলে। খালেদকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বিপ্লবে যোগ দেয়।

কমান্ডিং অফিসারের রুমে বসা ছিলেন তারা। সিপাহীদের বিপ্লবী তৎপরতায় ঐ ইউনিটের অফিসাররা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

অতি বিপ্লবী সাজার জন্য হোক অথবা তাহেরের প্রভাবেই হোক, দুজন ক্যাপ্টেন খালেদসহ ঐ দুজন অফিসারকে তখনি হত্যা করে। জিয়া যখন জানতে পারেন খালেদ ১০ম বেঙ্গলে রয়েছেন তখন তিনি কমান্ডিং অফিসারকে তার নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

অভিযোগ রয়েছে, টেলিফোনে ঐ নির্দেশটি দেয়ার সময় তাহের সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেটাই নাকি ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সাতই নভেম্বর :মূল্যায়ন ও তাৎপর্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

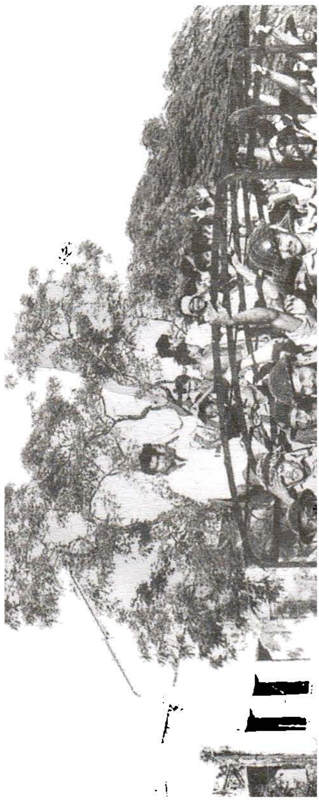

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাহবুব আনাম

সংহতি দিবসের চেতনা অবমূল্যায়ন ইতিহাস বিরোধী

সাতই নভেম্বরের বিপ্লব কি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না-কি এর ঐতিহাসিক পরম্পরা আছে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বারবার এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে যদি এর অন্তর্নিহিত বাণী আমরা অগ্রাহ্য করি।

এবার একটু পিছন দিকে তাকানো যাক। বাংলাদেশের বর্তমান মোটামুটি ৫৫০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডটি প্রথমে সুবে বাংলার অংশ হিসেবে মোগল, পাঠান আমলে নবাব ও সুলতানী শাসনাধীন ছিল। পরে জগৎশেঠ, মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ বেনিয়া রবার্ট ক্লাইভ শঠতা ও চক্রান্তের মাধ্যমে প্রায় বিনা যুদ্ধে নিজেদের করায়ত্তে নেয়

দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলের শাসক অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় নবাবী-জমিদারি ভূ-সম্পত্তি হারিয়ে মালিক থেকে শ্রমিকে পরিণত হয়। শিক্ষিত, মার্জিত, কুলীন, বনিয়াদী বর্ধিষ্ণু একটি সম্প্রদায় থেকে অশিক্ষিত, অসভ্য, অমার্জিত, দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী, দুঃস্থ-গরিব কৃষক ও শ্রমিকে পরিণত হয়। পাশাপাশি ওদেরই এককালীন প্রজা, উমেদার, অমাত্য সকল সম্প্রদায় রাতারাতি বনে যায় জমিদার ও মালিক।

রাজার চাইতে অমাত্য'র লম্ফঝম্ফ, অত্যাচার বেশি হলো এ জন্য যে, অমাত্যের জন্য এটা ছিল রাজা পরিবর্তন আর মুসলমানদের জন্য ছিল সিংহাসনসহ সবকিছু হারানোর বেদনা।

পলাশীর পরাজয়ে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটে বাংলারই বুকে। এটা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হতে এবং মোগলদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে করতে বাংলা (অর্থাৎ হিন্দু বাংলা) প্রায় শত বছরের ব্রিটিশ শাসন সুবিধা একাই উপভোগ করে।

পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর বহুল আলোচিত বই ডিস্কভারি অব ইন্ডিয়া (৮ম সংস্করণ ১৯৮৯) দ্রষ্টব্য। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্থান সম্পূর্ণভাবে ছিল হিন্দু বাংলার। এরা ব্রিটিশ অধিগ্রহণকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পেরেছিল। আর মুসলমানরা তা পারে নি।

কাজেই বাংলার মেজরিটি সম্প্রদায়ের ফ্যাল ফ্যাল করে রাতারাতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাইনরিটির শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা ছিল না।

বাংলার মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা বর্জন ও ব্রিটিশ শাসন বিরোধিতার ফলে শাসক সম্প্রদায়ের রোষানলে পড়ে এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে

www.pathagar.com

বঞ্চিত হয়। ছলে-বলে-কৌশলে দেশের নওয়াবী আমলের জমিদার সম্প্রদায় ধ্বংস করার লক্ষ্যে মুয়াফিজ (লাখেরাজ সম্পত্তি) প্রথা বাতিল করে সেগুলো নতুনভাবে তাদের বিশ্বস্তদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হলো, যার ফলে এর উপর নির্ভরশীল (বেশিরভাগ মুসলিম) পরিবারবর্গ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (ফার্সি ভাষা নির্ভর) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

এর ফলে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা বিলুপ্ত করার সঙ্গে-সঙ্গে পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল হয়ে রাজনৈতিক আগ্রাসনের সঙ্গেই সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের সূচনা হয়। বিশাল এক জনগোষ্ঠিকে ভূমিহীন ও সেই সঙ্গে করা হলো অশিক্ষিত।

সাতই নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতি দিবস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এত পুরানো প্রসঙ্গের উত্থাপন প্রাসঙ্গিক কেন এবং এর সঙ্গে যোগসূত্র কী— এ প্রশ্ন অনেকেই করবেন।

আগেই বলেছি, কীভাবে বাংলার মেজরিটি বর্ধিষ্ণু সুশিক্ষিত, সুমার্জিত সমাজ কেন এবং কীভাবে অবক্ষয়ের শিকার হলো। সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে ক্রমাগতভাবে বহিষ্কৃত হয়ে অবশেষে এরা পুঁথি রচনার মাঝে এর তৃপ্তি খুঁজে পেত। সেই সঙ্গে এরা ধর্মে আসক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী সম্প্রদায়ের রাতারাতি উন্নতির সঙ্গে নিজেদের গুটিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু করে।

পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতা ও পরাজয়ে যার সূত্রপাত হয়েছিল ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহে— যেটা চূড়ান্ত রূপলাভ করে সেটা ছিল আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তিমূল। দশ বছর একটা অতৃপ্তি নিয়ে একটা বিক্ষুব্ধ জাতি কীভাবে নিজেদের জাতিসত্তা বাঁচিয়ে রেখেছিল, ভাবতে অবাক হতে হয়।

ব্রিটিশ শাসনের প্রায় পুরো সময়টাই বাংলার দৃশ্যপট ছিল মেজরিটির দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষার কষাঘাতে জর্জরিত। এরা এটা মেনে নিয়েছিল। স্বাগত সুদিনের অপেক্ষায়। এ-সময় কিছুটা সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে (যার বেশিরভাগই ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল) ভীত হয়ে অথবা বিবেকের দংশনে শাসক সম্প্রদায় মুসলমানদের দিকে সদয় দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। এসময়ে ১৯০৫ সালে বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো— যার এক ভাগের রাজধানী করা হলো ঢাকাকে।

এর আগে রাজধানী (সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের) কলিকাতা হওয়াতে পূর্ব বাঙালি অর্থাৎ মেজরিটি বাঙালির অবস্থান ছিল প্রতিকূল। কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতিসহ তাবৎ কার্যকলাপে তাদের অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল। সেটার অবসানকল্পেই ঢাকা কেন্দ্রিক আরেক বাংলার সৃষ্টির পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়।

কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত ও প্রভাবিত পশ্চিম বাংলা নেতৃত্ব যাদের পণ্ডিত নেহেরু ভারতীয় রাজনীতি ও প্রভাবশালী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তারা এটা হতে দেয়

www.pathagar.com

নি। সবশেষে ১৯১১ সালের দিল্লীর দরবারে ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন বাংলার সৃষ্টি বাতিল ঘোষিত হলো। বাংলাভাষাভাষি প্রভাবিত দুটি বাংলা সৃষ্টির মহান উদ্যোগ এভাবেই বিসর্জিত হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের নেতৃত্বে সমগ্র পূর্ব ভারতে বিকশিত হবার দরুণ সম্ভাবনাপূর্ণ এ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিল তদানীন্তন বাংলার হিন্দু নেতৃত্ব। এর পিছনে ক্ষুদ্র শ্রেণীস্বার্থ কাজ করেছিল।

মেজরিটি বাঙালির উপরই মাইনরিটি বাঙালির প্রভাব চিরস্থায়ী করার স্বার্থে ভারতে দুটি বাংলাভাষাভাষি প্রদেশের উত্থানকে ওরা নস্যাৎ করে দিল যা বাঙালি অথবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উত্থানের পথকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দেয়। বাঙালি মুসলমানদের উত্থান যুগকে এভাবে পিছিয়ে দেয়া হলেও এ ঘটনা মসুলিম পুনর্জাগরণে স্থায়ী অবদান রাখে।

দেড়শো বছর বঞ্চিত ও অবহেলিত মেজরিটি বাঙালি তাদের সম্বিৎ ফিরে পায় এবং ইংরেজি শিক্ষাকে বরণ করে নিয়ে সেই সঙ্গে নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে ধীরগতিতে অগ্রসরমান হয়।

কিন্তু ১৫০ বছরের পশ্চাৎপদতা কি অতি সহজেই মিটানো সম্ভব? পার্শ্ববর্তী অগ্রসরমানদের সঙ্গে সবরকম প্রতিযোগিতায় টিকে যাওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার তো বটেই বিশেষ করে তাদের পিছনে রাজার পৃষ্ঠপোষকতা আর এদের পিছনে প্রতিকুলতা স্পষ্ট।

এ-সব সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকায় এবং ভোটের মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদসমূহ পুনর্গঠিত হবার কারণে দেখা গেল অর্ধশিক্ষিত, অর্ধউলঙ্গ দরিদ্ররাই শিক্ষিত, সুবেশধারী ধনীদের চাইতে শক্তিশালী। ভোটের মাধ্যমে প্রদেশে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীরা মন্ত্রিসভা গঠন করছে আর বঞ্চিত মুসলমানদের স্বার্থে গড়ে উঠছে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গঠিত হচ্ছে ঋণ শালিসী বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, মহাজনী আইন এবং জমিদারি উচ্ছেদ আইনের প্রস্তুতি। এতে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দারুণভাবে আতঙ্কিত করে।

এরই ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে যারা জান বাজি রেখে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধিতা করে তারাই ১৯৪৭ সালে জীবনপণ করে বাংলা ভাগের দাবি জানায়। ইতিহাসের এ এক বিচিত্র ঘটনা।

পশ্চিম বাংলা যত দিন পূর্ব বাংলাকে শোষণ করতে পেরেছে তত দিনই বিভাগ পূর্ব বাংলা এক থেকেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গতিপ্রকৃতি দেখে যখন স্পষ্ট মনে হলো যে, তাদের শোষণের দিন শেষ, এখন পূর্ববঙ্গবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার দিন এসেছে তখনি বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো। দুটো ঘটনা ঘটেছিল মাইনরিটি বাঙালির স্বার্থে। মাইনরিটির অত্যাচারে বাংলা মেজরিটি পাকিস্তান সমর্থন করলে বাংলাকে ভাগ করতে চায় নি বরং গ্রেটার ও ইউনাইটেড বেঙ্গল চেয়েছিল। কিন্তু অন্যেরা সেটা চায় নি।

www.pathagar.com

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল পাকিস্তানের সৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান হলো। কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল আমরা পশ্চিম বাংলার খপ্পর থেকে বেরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের খপ্পরে পড়েছি মাত্র। প্রথমটিতে দুশ বছরের সুবিধাপ্রাপ্তদের জমিদারিত্বের ও সেই সঙ্গে ভাষার সংস্কৃতির আগ্রাসনে নাভিশ্বাস হয়ে পাকিস্তানের মাঝে মুক্তি খুঁজে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হয়।

পরম পরিতাপের বিষয় একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে জাতির পরিচয়ে বৈপ্লবিক সংশোধনী দেশবাসী আশা করেছিল, সেটা সফল হয় নি। পিপলস ওয়ার বা জনযুদ্ধকে গোষ্ঠিবিশেষ নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়ে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি আশ্রিত রাজ্যে, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটি বিকলাঙ্গ শিশু, ধর্মীয় ও সামাজিকতার দিক দিয়ে একটি দিক নির্দেশনাবিহীন জাতিতে পরিণত করার নীলনকশাকে কার্যকর করার প্রচেষ্টায় তা ধূলিস্যাৎ হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর সরকারের ব্যর্থতা জাতির আত্মপরিচয়ের সেই অতৃপ্ত ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতাসীন দল নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করে দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কীসের জন্য আমরা এত ত্যাগের বিনিময়ে একবার ১৯৪৭ সালে আরেকবার ১৯৭১ সালে স্বাধীন হলাম? কোথায় আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব? দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য না এলে স্থানীয়ভাবে বিভক্তি এনে কে লাভবান হচ্ছে? এ-সব কারণেই ৭ নভেম্বর আমাদের জীবনে একটি গভীর তাৎপর্যসম্পন্ন দিন। এ দিন দেশের আপামর জনসাধারণ ও সিপাহী এক হয় এবং একটি রক্তপাতহীন বিপ্লবের জন্ম দেয়।

এ বিপ্লবে কে নেতৃত্ব দেয় এবং কার পতন ঘটে সেটা বড় নয়। সমগ্র দেশবাসী অনেক দিন পর এক হতে পেরেছিল আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা সংহত ও অর্থবহ করে তুলতে। আমরা ভাষায় বাঙালি যার যার নিজস্ব ধর্মে বিশ্বাসী একটি আলাদা অস্তিত্ব বলেই একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি নিয়ে থাকি নি। সে কারণেই দুবার ভেঙেছি তবু মচকাই নি।

৭ নভেম্বর ব্যর্থ হলে জাতির এক হবার এ বিপ্লবই হয়ে যাবে। তৃষ্ণা থেকে যাবে অতৃপ্ত। তবে এ তৃষ্ণা নিবারিত হবার প্রয়োজনে এটা বারবার ফিরে আসবে যথা সময়ে। এটাই একটি জাতির সত্যিকার বিবর্তন। কেউ চাক বা না চাক এটা হবেই। এ বিপ্লব ও সংহতি দিবস কোনো দল বা ব্যক্তির একার কৃতিত্ব নয়; যেমন ছিল না স্বাধীনতার যুদ্ধটা।

অতএব বর্তমান শাসক দলের এ দিনটাকে অবহেলা করার কোনো যুক্তি নাই। আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তিমূল এখনো নড়বড়ে। কেউ বলে আমরা বাঙালি কেউ বলে আমরা বাংলাদেশী। আমরা দুটোই এবং একটা আরেকটার পরিপূরক।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতি দিবস এ সত্যটাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এর ফলে আমাদের সংহতি ও ঐক্য আসা উচিত ছিল। এখন মনে হচ্ছে, তা আসে নাই এবং জাতিকে ঐক্যতাবদ্ধ করার বদলে এটাকে ছিন্নভিন্ন করার লক্ষ্যে নতুনভাবে পুরাতন ইস্যুগুলোকে জীবন্ত করা হচ্ছে।

শান্তির বদলে হিংসাদ্বেষ হানাহানির সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি কিন্তু সংহতি দিবসের চেতনার কথা বলি না। এটা বলতে হবে এবং জোরেশোরেই।

www.pathagar.com

সাদেক খান

৭ নভেম্বর ভারত-নির্ভর দায়বদ্ধতার মুক্তি দিবস

৭ নভেম্বর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে একটু পিছনের দিকে যেতে হয়। ১৯৭৩ সাল থেকেই বলতে গেলে আমি লন্ডন প্রবাসী। তবে দেশে প্রায়ই আসা-যাওয়া করছি।

'৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম না। তবে তার মাস খানেকের মধ্যেই দেশে ফিরলাম। এরই মধ্যে একটা মুক্ত মানসিকতার স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে শুরু করেছে সারা দেশে। ঢাকা আর চট্টগ্রাম যে দুটো শহরে আমার ঘোরাফিরার অবকাশ হলো নিজের কাজ আর বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ-খবর নেবার সুবাদে, দেখলাম সবাই খোলামনে কথা বলছে, অকপটে ভয়-ভাবনা প্রকাশ করছে। তবে রাস্তা-ঘাট তখনো রাতের বেলা তেমন নিরাপদ নয়।

ঢাকায় যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তাদের অধিকাংশ ছিল খেলাঘরে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। মেজর (পরবর্তীকালে) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রতি তাদের অনেকেরই একটা স্বাভাবিক আনুগত্য ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল। তাদেরই একজন তরুণ, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, পঁচাত্তর সালের ৩ নভেম্বর কাকডাকা সকালে এসে আমাকে জাগিয়ে জানাল, খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় এসেছে। মুক্তিযোদ্ধারা আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তাঁর পেছনে রয়েছে।

১৫ আগস্টের বিদ্রোহী মেজররা সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। তাদের কোণঠাসা করে সেনাশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়া হবে। খন্দকার মোস্তাক সেনাবাহিনীর কথামতো চলে নামমাত্র ক্ষমতায় থাকতে পারেন পোশাকী রাষ্ট্রপতি হিসেবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর হাতে।

একইসঙ্গে আরো একটা খবর এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আমাকে দিল। সেটা এই যে, সামরিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য এরকম বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ নিতে সম্মত ছিল না বলে এবং প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাককে সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ না করার দায়ে মোস্তাক নিযুক্ত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা হয়েছে।

আমার খটকা লাগল। আমি বললাম, সেনাবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজ নেতা, রাজনীতিবিদ আর অরাজনৈতিক মুরব্বি— এদের মধ্যে মতভেদ বা লক্ষ্যের তারতম্য যাই থাক না কেন, জাতি গঠনের তাগিদ আছে সবারই। রাষ্ট্রের এই সঙ্কটের সময় একতরফাভাবে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক উপলব্ধি চাপিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। সবাই মিলে বোঝাপড়া করেই এগুতে হবে।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান শুধু সেনাপ্রধান নন, স্বাধীনতার ঘোষক। মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনীর অফিসার কিংবা জওয়ান, শহুরে নাগরিক কিংবা গ্রামবাসী—যারাই সেই স্বাধীনতার ডাক শুনেছিল, তাদের পরিচিত নাম, প্রিয় নাম জিয়াউর রহমান।

তাঁকে আটক করে সেনাশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের কথা বলা ধৃষ্টতা। শেখ মুজিব দেশবাসীর আস্থায় একবার আঘাত হেনেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রু সৈন্যের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে। অনেকেরই মনে ধারণা জন্মেছিল যে, মুক্তি-সংগ্রামকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসায় যাবেন শেষ পর্যন্ত, আর ইতোমধ্যে জঙ্গী ছাত্র-যুব সমাজ ধরা পড়ে মার খেয়ে ঠাণ্ডা হবে।

তিনি ভাবতে পারে নি যে, মুক্তিযুদ্ধ দানা বাঁধতে পারবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ দানা বেঁধেছিল। কারণ, সাচ্চা প্রতিরোধের শপথগ্রহণ করেছিল দেশবাসী আর তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলসের দেশপ্রেমিক বেশ কিছু সিপাহী। জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে জীবনপণ করেছিলেন তারা। সিপাহী জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ-চেতনার সূত্রপাত তখন থেকে।

সেখানে শেখ মুজিবের নাম ভূমিকা ছিল মাত্র, নেতৃত্ব ছিল আক্রমণের মুখে আত্মসমর্পণের গ্লানি-মলিন। মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছিল লক্ষ তরুণ। তাদের দ্বিধা ছিল না। আর সশস্ত্র লড়াই ও প্রতিরোধের শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের আনাচেকানাচে তারা গোপন অবস্থান পাকাপোক্ত করে বিশ্ববাসীর বিবেককে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছিল যে, এ লড়াই চলছে— চলবে। দেশবাসী আত্মসমর্পণ করবে না।

তাই শুধু প্রতিবেশী দেশ নয়, অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জোরদার রব উঠেছিল। ফরাসি লেখক ও ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধযোদ্ধা আঁদ্রে মালরো ঘোষণা দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সাত মাসের মাথায়, আর বক্তৃতা-বিবৃতি, সেমিনার, লেখালেখি নয় ; বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম জোগাতে বিবেকবান বিশ্ব-সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তার সে কথা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও সেদিন ভালোভাবে নিতে পারেন নি।

কারণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মিত্রশক্তি হিসেবে একটা মনোপালি অভিভাবকত্বের মতলব ছিল তাদের। সেটা পরবর্তীতে আরো সপ্রমাণিত হয়েছে।

যাহোক, মুক্তিযুদ্ধের আট মাসের মাথায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একক সহযোগিতায় যৌথ অভিযানের শরিক হিসেবে কার্যত তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসা হলো।

বাংলাদেশ সরকার তার নিজ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু নির্ভরতায় দায়বদ্ধ হয়ে রইল। শেখ মুজিব ফিরে এলেন। কিন্তু প্রতিবেশী-নির্ভর

www.pathagar.com

দায়বদ্ধতা মিটল না।

শেখ মুজিব দ্বিতীয়বার দেশবাসীর আস্থায় আঘাত হানলেন রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় একের পর এক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে। তারপর দেশবাসী সকলকেই জিম্মি করে তিনি বলতে গেলে একরকম তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও একদলীয় দুঃশাসনের অবতারণা করলেন। সপরিবারে প্রাণ দিয়ে তাঁকে সেই দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

সেনাবাহিনীর যে গুটি কয়েক অফিসার ঝুঁকি নিয়ে এই ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ঘটিয়েছিল, ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে প্রেসিডেন্ট মোস্তাকের প্রশ্রয়ে হয়তো-বা তারা হঠকারিতা করছিল। সে জন্য তাদের শাসনের উদ্যোগ অবশ্যই সেনাবাহিনী নিতে পারে। কিন্তু সে জন্য আরেকটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে সেনাপ্রধানকে আটক করে প্রেসিডেন্ট মোস্তাককে ঘেরাও করে সেটা হতে পারে না। তাতে আরো বেশি বিশৃঙ্খলা ঘটাই স্বাভাবিক।

আমার মুখে একথা শুনে সেদিন বিমর্ষমুখে ফিরে গিয়েছিল খালেদ-ভক্ত সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু আমার যুক্তিকে সে গ্রহণ করেছিল। একটু বেলা হতে সকাল এগারোটা নাগাদ আমার গাড়ির ড্রাইভার এসে হাজির। সে ছুটিতে গিয়েছিল। তখনি রাজশাহী থেকে ফিরল। সে বলল, খুব সকাল থেকেই জিয়ার আটক হবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। পথে সে দেখেছে, অনেক জওয়ান যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই ঢাকার দিকে আসছে। তারা খুবই উত্তেজিত।

লোক পাঠিয়ে বা টেলিফোনে যোগাযোগ করছে তারা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে তাদের জানাশোনা সিপাহীদের সঙ্গে। খালেদ মোশাররফকে বেঈমান আর ভারতের দালাল বলছে তারা। জিয়াকে আটক রাখতে পারবে না খালেদ, তার এই বিশ্বাস জন্মেছে— বলল আমার গাড়ির ড্রাইভার।

তাকে নিয়ে এখনে-ওখানে বন্ধুগৃহে আর মতিঝিলে কিছু দপ্তরে ঘুরে আমারও বিশ্বাস জন্মালো, খালেদের ক্ষমতালিপ্সা তার কাল হয়ে দাঁড়াবে। ৪ নভেম্বর যে কিছু জয় বাংলা মিছিল বেরুল, তাতে ব্যাপকভাবে মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হলো যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনেই খালেদ মোশাররফ এমন দুঃসাহসী বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, অনুগত গুটিকয়েক অফিসার ছাড়া সেনাবাহিনীর মনোভাব জানার কোনো চেষ্টা সে করে নি।

ভারত শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর করেছে। শেখ মুজিবের হত্যার পরেও প্রতিবেশী-নির্ভর দায়বদ্ধতা আমাদের কাটে নি। শক্তিমত্ত প্রতিবেশীর প্রচ্ছন্ন চাল আর কারসাজিতে ঘটছে এ-সব অঘটন। ৬ নভেম্বর নাগাদ বঙ্গভবনে তাদের নীলনক্শা আর পদমর্যাদা বৃদ্ধির পোশাকী মহড়া নিয়ে ব্যস্ত খালেদ সহযোগীরা ছাড়া সারা দেশই জানে, ৩ নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। সিপাহী-জনতা জেগেছে। জিয়াকে মুক্ত করতে তারা চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে।

www.pathagar.com

সিপাহী-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ চেতনার যে জাগৃতি ঘটেছিল ২৬ মার্চ জিয়ার বেতার ঘোষণার মধ্যে, সেটাই দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটাল ৭ নভেম্বর জিয়াকে মুক্ত করে মুক্ত বাংলার নয়া অধ্যায়ের সূচনা করে।

সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান সেদিন কবর রচনা করেছিল প্রতিবেশী-নির্ভর দায়বদ্ধতার। বাংলাদেশের স্বনির্ভর সার্বভৌম সত্তার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিল সেই সিপাহী-জনতার গৌরবোজ্জ্বল ঐক্যজোট।

৭ নভেম্বরের সেটাই তাৎপর্য। আর তাই ৭ নভেম্বরেই সবাই মিলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। কবর খুঁড়ে যারা ভারত-নির্ভর দায়বদ্ধতা আবার দেশবাসীর কাঁধে চাপাতে চাইছে, ইতিহাস তাদেরই কবর তৈরি করছে।

www.pathagar.com

ড. এমাজউদ্দিন আহমদ

সংহতি দিবসের তাৎপর্য

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লব ছিল একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শুধু এখন নয়, দীর্ঘদিন পরেও এই বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবসের শ্লোগানগুলো পর্যালোচনা করুন। তাদের মর্মবাণী অনুধাবন করুন। অনুভব করতে কোনো অসুবিধা হবে না যে, এটি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৭ নভেম্বরের সংহতি দিবস এ জাতির ইতিহাসের গতিপথ প্রায় সুনির্দিষ্ট করেছে। নতুনভাবে জাতিকে পথনির্দেশনা দান করেছে। এই পথ থেকে বিচ্যুত হলে ক্ষমতাসীনদের জন্য তা সঙ্কট সৃষ্টি করতে বাধ্য।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল জিয়াউর রহমান Holiday পত্রিকায় লিখেছেলেন, "স্বাধীনতা জনগণের জন্য এক যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়ালে দেখবেন, শুধু উদ্দেশ্যবিহীন, উদাসীন, নির্জীব মুখগুলো। কোনরকমে যেন সবাই টিকে রয়েছে। সর্বত্র নিস্প্রাণ মানুষের মিছিল যেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে সাধারণত এক নতুন শক্তির জন্ম হয়। দেশ পুনর্গঠিত হয় প্রায় শূন্য থেকেই। বাংলাদেশে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। সমগ্র বাংলাদেশ হয় ভিক্ষারত, না হয় শোকগীতি গাইছে অথবা অসচেতনভাবে চিৎকার করছে।"

স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাংলাদেশের চিত্র ছিল প্রায় এমনি। যদিও এক নদী রক্তের মধ্যদিয়ে জন্মলাভ করেছে বাংলাদেশ। এই প্রেক্ষাপটে সংহতি দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।

আমরা বলি, ১৯৭১-এর ষোল ডিসেম্বর থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ তার জয়যাত্রা শুরু করে। ভিন্নমত প্রকাশ করে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন— ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ কার নিয়ন্ত্রণে ছিল?

মুজিবনগর সরকার ছিল বটে, কিন্তু কখন তারা রাজধানীতে পা রেখেছিলেন? এই কদিন কে চালিয়েছে বাংলাদেশ?

আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈনিক ও কর্মকর্তা, বিশেষ করে তাদের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের যে সম্পদরাজি ছিল তার কী হলো? অস্ত্রভাণ্ডারের কথা বাদই দিন। যানবাহন ও পরিবহণের সাজ-সরঞ্জামের কী হয়েছিল? এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সহজ নয়।

মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল এর কিছু অংশের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ছিল না। এর আংশিক উত্তর দিতে চেয়েছিলেন আর

www.pathagar.com

একজন কৃতী মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের। তিনিই ছিলেন ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতি দিবসের প্রাণপুরুষ।

৭ নভেম্বরের বিপ্লব দিবসকে একটি সাধারণ সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। ৩ নভেম্বরে সংঘটিত মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটিকে একটি 'প্রতি-অভ্যুত্থান' (Counter-coup) হিসেবে চিহ্নত করাও ঠিক নয়।

৭ নভেম্বরের কাহিনী সম্পূর্ণ নতুন। একটি বিপ্লবের যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার প্রায় সবগুলো বিদ্যমান রয়েছে এতে। হ্যানা এ্যারেন্ডটের (Hanna Arendt) কথায়, বিপ্লবে "ইতিহাসের গতিধারা হঠাৎ করে নতুন এক মোড় নেয় এবং সূচনা হয় সম্পূর্ণ এক নতুন কাহিনীর, যে কাহিনী এর পূর্বে জানা যায় নি বা বর্ণিত হয় নি।" [The course of history suddenly begins a new, that an entirely new story, a story never known or told before, On Revolution, 1965, 21] এই বিপ্লবের ফলে জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন হলেন ৭ নভেম্বরে, যদিও খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বরে তাকে বন্দি করেছিলেন এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে পদত্যাগে তাকে বাধ্য করেন (এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে লেখকের Military rule and Myth of Democracy গ্রন্থে, University Press, 1998)।

৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে সূচিত হয় বহুমুখী ধারা। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের যে আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বাংলাদেশ তার জয়যাত্রা শুরু করে এবং পথমাঝে যার গতি রুদ্ধ হয়, আর সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্বাসনের সূচনা হয়।

যন্ত্র-ছিন্ন-অনৈক্যে ভরা জাতীয় জীবনে নতুনভাবে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির সূচনাও হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক শর্তাবলীর মূল বহু দল, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বাধীন সংবাদপত্র প্রভৃতির ক্রমবিকাশের পথও সুগম হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আধুনিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের দলগুলোর বিকশিত হবার সুযোগ ঘটে।

জাতি সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর পরিধি বিশিষ্ট বাংলাদেশী রাষ্ট্রীয় চেতনায় সমুজ্জ্বল হবার সুযোগ লাভ করে। খুঁজে পায় তার স্বতন্ত্র ঠিকানা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ-ভারতের কক্ষপথের অন্ধকার থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মুক্তিলাভ করে বিশ্বময় বিস্তৃত হবার সুযোগ লাভ করে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো— মুক্তিযুদ্ধের অনলকুণ্ড থেকে জন্মলাভ করে যেভাবে মাথা উঁচু করতে শিখেছিল বাংলাদেশ, নতুনভাবে আবারও মাথা না নোয়ানোর সঙ্কল্প লাভ করে ৭ নভেম্বরের সংহতি দিবসের শ্লোগান থেকে।

৭ নভেম্বরের বিপ্লব এবং সংহতি দিবসের তাৎপর্যের আর একটি দিক

www.pathagar.com

হলো— এই আন্দোলনে সৈনিক এবং জনতার মধ্যে এতোদিন পর্যন্ত যে অনতিক্রম্য ব্যবধান বিদ্যমান ছিল, তার অবসান ঘটল। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সিপাহী ও জনতার সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠ সমগ্র সমাজকে সচকিত করে তোলে। এদিক থেকে বলা যায়, প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সার্বিক পুনর্গঠনের সূচক এই সংহতি দিবস। সার্থক রাষ্ট্রনায়ক দুই এর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে, উভয়কে উভয়ের পরিপূরক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলে, দায়িত্বশীলতাও স্বচ্ছতার স্বর্ণসূত্রে উভয়কে আবদ্ধ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক সুষম পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। সেই ধারণার সূত্রপাত তখন থেকেই।

সংহতি দিবসের অন্যতম তাৎপর্য হলো— দেশের বিপ্লবী এবং 'অতি-বাম' রাজনৈতিক দলগুলোর তত্ত্বগত দেউলিয়াপনার সুস্পষ্ট প্রকাশ। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে, বিশেষ করে গণবাহিনীপ্রধান খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংহতি দিবসের কার্যক্রম যেভাবে বিন্যস্ত হয়, তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে এক করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। বিশ্বের এই অঞ্চলে সৈনিকদের বিদ্রোহ নতুন নয়।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ভারতেও সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। পণ্ডিত নেহরু একে ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য 'প্রথম বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন। সে বিদ্রোহ কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে নি। অল্পায়াসেই তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। কেননা, কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের সমর্থন ব্যতীত তা সফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধও শুরু হয় সৈনিক বিদ্রোহের মাধ্যমে। যেহেতু তখন বাংলাদেশে ছিল ব্যাপক গণসমর্থনপুষ্ট সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দল। তাই দলের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সফল পরিণতির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের৭ নভেম্বরের সৈনিক বিদ্রোহের দর্শন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমে 'শ্রেণীহীন' একটি সামরিক বাহিনীকে সচেতন এবং তীক্ষ্ণভাবে শাণিত করে, পরে তারই মাধ্যমে একটি 'শ্রেণীহীন' সমাজ গঠনের যে পরিকল্পনা তখন গৃহীত হয়েছিল, সার্বিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য তা যে উপযোগী নয়, তাও প্রমাণিত হয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সমাজে ব্যাপক গণসমর্থনপুষ্টও ছিল না। ঐ সময়ে সামাজিক চেতনায় যে দুটি ধারা প্রচলিত ছিল ভারতবিরোধী এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের চেতনা।

৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ তার একটিতে অর্থাৎ ভারত বিরোধী চেতনায় অতি সহজে ঘায়েল হন বটে, কিন্তু অন্যটির অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের চেতনা সামরিক বাহিনীতে যেমন অপ্রতুল হয়ে পড়ে, সমাজে বৃহত্তর অঙ্গনেও তা থেকে যায় নিরুত্তাপ। ঐ মুহূর্তে

www.pathagar.com

জাতীয় স্বার্থের সাথে ভারত বিরোধী চেতনার সমন্বয় সাধিত হবার ফলেই বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, কৃতী মুক্তিযোদ্ধা এবং একাত্তরের অনিশ্চিত মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণাদানকারী জিয়াউর রহমান সিপাহী-জনতার সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশে হলেন ক্ষমতাসীন। তিনি ক্ষমতাসীন হলেন কোনো পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে নয়, নয় কোনো ষড়যন্ত্র অথবা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তিনি শুধু ক্ষমতার শূন্যতা পূর্ণ করেন এই বিপ্লবের মাধ্যমে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল দেবার জন্য তাই এখনো বলে চলছে, এই বিপ্লবের সুযোগ অন্যে গ্রহণ করেছে এবং তারা এর সুফল লাভে বঞ্চিত। কিন্তু ৭ নভেম্বরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যে পরিকল্পনাগ্রহণ করে তা যে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য তা তারা স্বীকারে সঙ্কোচবোধ করছেন এখনো।

তা যাই হোক, জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে যখন অভ্যুত্থান ও প্রতি অভ্যুত্থানের আঘাতে আঘাতে জাতীয় নিরাপত্তা পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়ে ওঠে, সামরিক বাহিনীর মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি যখন বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিস্বার্থের মাধ্যম হয়ে ওঠে, তখন সংহতি দিবসের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়ে গেল। এই জন্যই এ দিবসটি এই জাতির ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ জিয়ার ভূমিকা।

তার এই ভূমিকার প্রশংসা করে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক সাফায়াত জামিল Holiday-তে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "প্রকৃত প্রস্তাবে জিয়াই জাতিকে সার্বিক নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেছেন। ৭ নভেম্বরে রক্ষা করেছেন ভারতের পুলিশ এ্যাকশন থেকে।" [Zia in fact saved the nation from total anarchy, and a possible police action from India on 7 November.] তিনি আরো বলেন, "এটি সত্যিই, জিয়ার অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ যা তিনি নভেম্বরের ঐসব সঙ্কটময় মুহূর্তে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যথায় পুলিশ এ্যাকশনের নামে ভারতের হস্তক্ষেপ দেখা দিতে পারত।"

৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক সংহতি দিবসের ফলে জেনারেল জিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ এ কারণেই হয়ে রয়েছে এত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টিকে রইল স্বাধীন এ্যাক্টররূপে, জন্মক্ষণে যে সর্বগ্রাসী স্বাধীনতার প্রত্যয় লাভ করেছিল তা অক্ষুণ্ন রেখে।

জনগণের তখনকার চিন্তা-ভাবনা আজকের চিন্তা-ভাবনা থেকেও তেমন ভিন্ন নয়, বিশেষ করে আধিপত্যবাদী প্রতিবেশী এবং সেই প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে খুশি করার সরকারি মনোভাবের প্রেক্ষাপটে। তা ছাড়া, যারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনে উদ্যোগী, বাস্তবতার নিরিখে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে দেশের সমস্যা সমাধানে আগ্রহী, তাদের জন্যও ৭ নভেম্বরের

www.pathagar.com

শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাদের নিকট আজও ৭ নভেম্বরের আবেদন বিন্দুমাত্র কমে নি।

প্রায় তের কোটি জনসমষ্টি অধ্যুষিত বাংলাদেশে রয়েছে এক ঐতিহাসিক গন্তব্য। এই গন্তব্যে পৌঁছতে হলে বাংলাদেশকে তার অধ্যাত্ম সত্তার ওপর নির্ভর করেই পথ চলতে হবে, কারো নির্দেশে নয়। নয় কারো ইঙ্গিতে। এ-সব বিবেচনা করলে ৭ নভেম্বরের অন্তর্নিহিত সত্যের কোনো বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

৭ নভেম্বরের তাৎপর্য

জুলিয়াস সিজার সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে 'He came, he saw and he conquered.' জিয়াউর রহমান সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে। যদিও জুলিয়াস সিজারের অভিযান ছিল অপর দেশ বিজয়ের, অপর দিকে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা জিয়াউর রহমানের কোনোদিনই ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে জয়লাভ তিনি করেছেন তা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের হৃদয়।

জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব আসলেই ধূমকেতুর মতো হঠাৎ করেই হয়েছিল। কিন্তু ধূমকেতুর মতো তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে হারিয়ে যান নি। বরং মানুষের মনের মণিকোঠায় তিনি চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলে আসছে তার মূল কারণ এখানেই। আসলে জিয়াউর রহমানকে যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিতাড়িত না করা যায় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে।

রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের প্রথম আবির্ভাব ১৯৭১-এর মার্চে, যেদিন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিশেহারা বিভ্রান্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেন। এরপর তিনি অনেকটা পেছনের কাতারে স্বপেশায় ফিরে যান। এরপর দ্বিতীয়বারের মতো তাঁকে আবার রাজনীতিতে দেখা গেল ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। আগের বারের মতো এবারেও তাঁর আবির্ভাব অনেকটা ঘটনাচক্রেই ঘটেছিল। এখানে ঐদিনের ঘটনাবলীর একটি পটভূমি দেয়া দরকার।

স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের তিন বছরের শাসনামলে জনজীবন বিভিন্নভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আকাশ-ছোঁয়া মূল্য, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে ব্যক্তি-জীবনের নিরাপত্তাহীনতা সবকিছুই জনগণের জন্য ছিল অনেকটা জগদ্দল পাথরের মতো। জনগণের মৌলিক অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা— এ-সব কিছুই কেড়ে নেয়া হয়েছিল।

এ-ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল আধিপত্যবাদের প্রভাব। এ ধরনের অবস্থা যখন চলছিল তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন হয়। অভ্যুত্থানটি ছিল খুবই মর্মন্তুদ ও শোকাবহ। তবে দেখা গেল যে, ক্যুদেতার পরে আওয়ামী লীগেরই একজন প্রাক্তন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ক্ষমতায় আসীন হলেন এবং যাদেরকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হলো তারা সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগার।

এ সরকার আড়াই মাস যাবৎ দেশ শাসন করে। ৩ নভেম্বর দেশে আর একটি সেনা-অভ্যুত্থান হয়। এই অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল

www.pathagar.com

খালেদ মোশাররফ।

খালেদ মোশাররফ ছিলেন সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ করেন, খন্দকার মোস্তাক আহমদকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারণ করেন, পার্লামেন্ট বাতিল করেন, জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে-সব তরুণ অফিসার সেনা-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন তাদের সাথে যোগসাজশে খালেদ মোশাররফ তাদেরকে দেশের বাইরে চলে যাবার সুযোগ করে দেন।

লক্ষণীয় এই যে, খালেদ মোশাররফের ক্যু-দেতার খবর এদেশের মানুষ জানতে পারে ভারতের আকাশবাণী থেকে। ঐ দিনের ক্যু-দেতা সম্পর্কে এন্থনী ম্যাসকারেনহাস তাঁর 'বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্বৃত করা হচ্ছে— "মোস্তাক আর মেজরদের উৎখাতের খবর শুনে আওয়ামী লীগের ছাত্র ও মুজিব সমর্থিত দলগুলো রাস্তায় নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার তারা মুজিব দিবস হিসেবে পালন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শহীদ মিনারসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল বের হয়ে ৩২ নম্বর সড়কে মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

তারপর ৭ নভেম্বর শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশে শোকসভার আয়োজন করে। এ-সব কারণে জনগণের মনে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভ্যুত্থানের সূচনা করা হয় বলে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন জনগণ মুজিব আমলের দুঃস্বপ্ন সবেমাত্র কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

উপরন্তু ফারাক্কা বাঁধের জন্য তাদের মধ্যে ভারত বিরোধী চেতনাও চরমে উঠেছিল, সর্বোপরি তারা যখন আবিষ্কার করলো আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিচ্ছে তখন তারা বুঝে নেয় যে, তার অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত ও আওয়ামী লীগ জড়িত, এত কোনো সন্দেহ নেই ... ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও সরকারি রেডিও প্রচারণায় খালেদ মোশাররফের গুণগানে মুখর হয়ে উঠে।"

একদিকে স্বাধীনতার ঘোষক সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ছিলেন অন্তরীণ, অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ ভারতের প্ররোচনায় ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন এমন মনোভাব যখন সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এবং সাধারণ জনমনে বিস্তার লাভ করে তখন তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু জওয়ানরা যেহেতু নেতৃত্বহীন ছিল এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের জন্যে তাদের কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছিল না অথচ একই সাথে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল, তাই তারা অনেকটা অপরিকল্পিতভাবেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

www.pathagar.com

যার ফল ৭ নভেম্বর। ঐদিন তারা দলে দলে যে গৃহে জিয়াউর রহমান অন্তরীণ ছিলেন সেখানে জমায়েত হন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জিয়াউর রহমানের পক্ষে শ্লোগান দেন, তাঁকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে এবং স্কন্ধে করে তুলে নিয়ে (আক্ষরিক অর্থে) স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সকল কার্যক্রম প্রতিহত করার বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে ও মিছিল করে।

৭ নভেম্বর বিপ্লবের প্রধান তাৎপর্য এখানেই। প্রকৃতপক্ষেই এ বিপ্লব ছিল আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি সফল প্রয়াস। এর দ্বারা জাতীয় সংহতিও সুদৃঢ় হয়।

৭ নভেম্বর বিপ্লব যার প্রত্যক্ষ ফল জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রমঞ্চে আগমন, আমাদের জাতীয় জীবনে তার সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে এসেছে। এর একটি দিক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ণ।

বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের আবারও খানিকটা পিছন ফিরে তাকাতে হবে। গণতন্ত্রের অভিধা ব্যাপক। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য যথোপযুক্ত ছিল।

তবে তৎকালীন সরকার যে এ সংবিধান খুশি মনে গ্রহণ করেছিল তা মনে হয় না। কারণ দেখা গেল, সংবিধান গৃহীত হওয়ার অল্প কিছুদিন পর থেকেই সরকার এমন সব ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করল যে, তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল।

এখানে এর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ কম, তবুও মানবাধিকার খর্ব করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করা এবং গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধী একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। জিয়াউর রহমান এ-সবের অনেক কিছু পুনরায় সংশোধন করে জনগণকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ আমরা উল্লেখ করব।

'৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর শেখ মুজিবের শাসনামলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার দ্বারা সংবিধানে বর্ণিত জনগণকে প্রদত্ত ১৮টি অধিকারের মধ্যে ১২টি মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান '৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর স্থগিত মৌলিক অধিকারসমূহ পুনরুজ্জীবিত করেন। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৭৬-এর ২৮ মে জিয়াউর রহমান হাইকোর্টের সেই ক্ষমতাকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করেন।

৪র্থ সংশোধনী দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট/ হাইকোর্ট-এর মাননীয় বিচারপতিদের নিয়োগ, অপসারণ এবং চাকরিবিধি এমনভাবে পুনঃনির্ধারিত হয় যে,

www.pathagar.com

বিচারবিভাগ প্রকৃতপক্ষে তার স্বাধীনতা হারায়, যা গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধী। জিয়াউর রহমান বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, ১৯৭২-এর সংবিধানে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে বিচারপতিদের নিয়োগদান করার যে বিধি ছিল ৪র্থ সংশোধনীতে তা উড়িয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জিয়াউর রহমান প্রধান বিচারপতির সাথে অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের মাধ্যমে নিয়োগদানের রীতি প্রচলিত করেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের চাকরির সমাপ্তি ঘটানোর যে প্রক্রিয়া মূল সংবিধানে বর্ণিত ছিল প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা তা বিলোপ করে স্বহস্তে সমুদয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এইভাবেই সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর, বলা যেতে পারে, আজ্ঞাবহ করার পদ্ধতি চালু করেন।

জিয়াউর রহমান গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরদিনই মাননীয় বিচারপতিদের চাকরি থেকে অপসারণের কর্তৃত্ব নিজ হাতে না রেখে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুইজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত করেন।

নিম্ন আদালতের পূর্বের ৪র্থ সংশোধনী এবং অন্যান্য আইনের বলে যে ক্ষমতা হরণ করা হয়েছিল জিয়াউর রহমান তাও পুনর্বার পরিবর্তন করে নিম্নআদালতের স্বাধীনতা অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেন। একথাও সকলের জানা যে, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমান দেশে একদলীয় তথা বাকশালী শাসন পদ্ধতি চালু করেন।

জিয়াউর রহমান যেদিন সিপাহী জনতার বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রমঞ্চে আগমন করেন তার পরদিনই অর্থাৎ ৮ নভেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম তা রহিত করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, জিয়াউর রহমানের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সেদিন তা সম্ভব হতো না। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করার পর পার্লামেন্টে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা বহুদলীয় ভিত্তিতেই, একদলীয় বাকশালী পদ্ধতির আওতায় নয়।

আর একটি বিষয়-ও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা পার্লামেন্টে পাস হওয়া কোনো বিলে সম্মতি দান না করার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাও জিয়াউর রহমান '৭৮ সালে রহিত করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ আমলে কি মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে, কি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, কি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গণতন্ত্র বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর সেগুলো

www.pathagar.com

পুনরায় গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল।

১৯৭৫-এর সিপাহী বিপ্লবের এটি আর এক তাৎপর্য। ঘটনা পরম্পরায় বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে নির্বিঘ্নে উপনীত হওয়া যায় যে, জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রমঞ্চে আবির্ভাব না হলে দেশ বাকশালী শাসনের নিগড়ে বাঁধা থাকত।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। প্রথমত জনগণের মধ্যে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে একটি মনোভাব গড়ে উঠে। এর পরবর্তী পর্যায়ে যে শাসনব্যবস্থা চালু হয় তার ফলে আইন-শৃঙ্খলার প্রভূত উন্নীত হয়, অর্থনীতির অবনতি রোধ হয় এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলনের ফলে জনগণের মনে শান্তি ফিরে আসে।

ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভ করার ফলে জিয়াউর রহমান বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হন। তাঁর আমলেই দেখা গেল, বাংলাদেশ ওআইসির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আল কুদস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অবশ্য জিয়াউর রহমানের প্রধান অবদান সার্ক গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

যদিও কোনো কোনো সদস্যের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে সার্কের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নি কিন্তু তবুও এর অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে আঞ্চলিক রাজনীতির পর্যবেক্ষক মহল একমত।

জিয়াউর রহমানের প্রধান কীর্তি অবশ্য ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি। এখানে এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ কম। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে এ চুক্তি দ্বারা বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়েছিল। এ-সবই ৭ নভেম্বরের প্রতক্ষ বা পরোক্ষ ফল।

সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, আমাদের জাতীয় জীবনে ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ। এ দিনটি তাই এত দিন জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল।

প্রতিহিংসাপরায়ণ এই সরকার এদিনের ছুটি তো বাতিল করেছেই, উপরন্তু দিনটিকে সৈনিক হত্যা দিবস হিসেবে অভিহিত করে একদিকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদের বীজ বপণ করছে, অন্যদিকে জনগণের দৃষ্টিতেও ঐ দিনের সেনা-অভ্যুত্থানের তাৎপর্যকে মলিন করতে চাইছে। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ এমন অপচেষ্টা সফল হতে দিবে না বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

www.pathagar.com

ড. মাহবুব উল্লাহ

৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। ১৮৫৭ সালে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিপ্লব হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ইতিহাসবেত্তাদের মতে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবকে সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর যে-সব দার্শনিক ও পণ্ডিত এই বিপ্লবকে এই উপমহাদেশের জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন, তারা এই সিপাহী বিপ্লবকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কার্ল মার্কসের চোখে এটা ছিল— First Indian war of independence— যদিও এই বিপ্লবের আশু কারণ ছিল সিপাহীদের ব্যবহৃত এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে— এই গুজব সিপাহীদেরকে উত্তেজিত করে ফেলে এবং বিদ্রোহীতে পরিণত করে বলে মনে করা হয়; সেটাই কিন্তু সিপাহী বিপ্লবের আসল কারণ নয়। সিপাহী বিপ্লবের মূলে ছিল এদেশীয় সৈনিকদের মনে অংকুরিত স্বাধীনতার চেতনা। রাইফেলের কার্তুজ দাঁত দিয়ে ভেঙে ব্যবহার করতে হতো বলে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের সংস্পর্শ হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী সকল ধর্মীয় সিপাহীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়ায় এই বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমাদের ইতিহাসে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার বিদ্রোহ এ দেশের কৃষক বিপ্লবের ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ। নারকেলবাড়িয়ার জমিদারের নির্যাতন-নিপীড়ন, খাজনা ও আবওয়াবের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের তিতুমীর বেশ কিছুদিন ধরে ওয়াজ-নছিহত ও লোকগীতির মাধ্যমে সংগঠিত করছিলেন। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ দিনে দিনে ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারকেলবাড়িয়ার জমিদার প্রজাদের দাড়ি রাখার উপর আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর ধার্য করলেন। সেই মুহূর্তেই প্রকাশ্য অভ্যুত্থানের সূচনা হলো। তিতুমীর ও তার সহগামীরা অনেকেই শহীদ হলেন। গোরা সৈন্যরা এসে জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সরাসরি প্রজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। দরিদ্র-নিপীড়িত প্রজাকুল সাময়িকভাবে পরাস্ত হলো। ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লব আর তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার লড়াইসহ এদেশের ইতিহাসে অত্যাচারী ও বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনেক অভ্যুত্থানই তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করে নি। কিন্তু ১৯৭৫-এ ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার যে সম্মিলিত অভ্যুত্থান হয় তা এদেশে তাঁবেদারি ধারার রাজনীতিতে এক কঠিন আঘাত হানে। সেই তাঁবেদারগোষ্ঠি ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

www.pathagar.com

১৯৭৫-এর পর থেকে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দিনটি জাতীয় দিবস ও সরকারি ছুটি হিসেবে পালিত হয়ে এলেও ১৯৯৮ সাল থেকে এই দিবস আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালিত হচ্ছে না। আওয়ামী সরকার ১৯৯৭-এর নভেম্বরেও এই দিবসে জাতীয় ছুটি বাতিল করার সাহস পায় নি। কিন্তু তাদের দলীয়করণ নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তিরূপে পরিচিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে করায়ত্ত করার পর ১৯৯৮ থেকে দিবসটি জাতীয় ছুটি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারিয়েছে। দেশপ্রেমী জনতা বুঝতে পেরেছে কয়লা ধুলে যেমন ময়লা যায় না, তেমনি আওয়ামী লীগও কোনোক্রমেই ভারতের তাঁবেদারি নীতি বিসর্জন দিতে পারে না। আর সে কারণে একটি জাতীয় দিবস হিসেবে ৭ নভেম্বর দিনপঞ্জি থেকে মুছে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক সিপাহী ও জনতার হৃদয়কন্দরে এই দিবসের ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। বরঞ্চ মানুষ এ দিবসটিকে কেন্দ্র করে নতুন সংহতি ও প্রতিরোধের শক্তিতে দৃপ্ত হবার স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রচণ্ডভাবে আশান্বিত হয়েছিল যখন দিনাজপুরের মহাসমাবেশ থেকে বেগম খালেদা জিয়া এবারের ৭ নভেম্বর 'চল চল ঢাকা চল' কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, শাসকগোষ্ঠি যে দিবসটিতে তাদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি হতে দেখেছে, সেই দিবসটি এমন জঙ্গীভাবে রাজধানী ঢাকায় পালিত হবে সেটা কখনোই তাদের কাম্য হতে পারে না। এই বাধার মুখে দিবসটির প্রতি যথার্থ মর্যাদা জ্ঞান করতে হলে অবশ্যই ৭ নভেম্বরের চেতনাকে অবিচলভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। অন্যথায় একথা ভাবা অসমীচীন হবে না যে, আমরা ৭ নভেম্বরের চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। মুখে ৭ নভেম্বরের প্রদীপ্ত, চেতনার কথা বললেও অন্তরে তা বিশ্বাস করি না। এ রকম ভণ্ডামী ও কাপুরুষতা নিয়ে অত্যাচার ও উৎপীড়ন, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের জোয়ালে আবদ্ধ বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষকে কখনোই মুক্ত রাখা যাবে না।

ব্রিটিশ আমল থেকেই, এমনকি তারও আগে সম্রাট, রাজা-বাদশাহদের সৈন্যবাহিনীকে এ আঞ্চলের জনগণ সত্যিকার অর্থেই প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনীতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অংশীদারিত্ব না থাকায় এবং সাম্রাজ্যবাদীর প্ররোচনায় গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসন চালু হওয়ায় এদেশের জনগণ সেনাবাহিনীকে নিজস্ব সন্তান হিসেবে ভাবতে পারে নি। ১৯৭১-এর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার ফলে এদেশের মানুষের জন্য সেনাবাহিনী চরম ত্রাসের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অথচ প্রতিটি স্বাধীন ও সাবভৌম রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী রাষ্ট্র ও সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। সেনাবাহিনী নেই এমন কোনো রাষ্ট্র পৃথিবীতে নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো কোস্টারিকা। জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও বৈরিতার সম্পর্ক থাকলে কোনো রাষ্ট্রই

www.pathagar.com

শক্তিশালী হতে পারে না। দেশের ভেতর ও বাইরের শত্রু থেকে নিরাপদ হতে পারে না। যে দেশে সেনাবাহিনী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায় সে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করা আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি-গোষ্ঠির পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে দাঁড়ায়। একটি দেশের সেনাবাহিনী দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হলে কিংবা গণবিরোধী নীতি অনুসরণ করলে সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো লক্ষ করা যায়, বিদেশী প্রভূদের উচ্ছিষ্টপুষ্ট কতিপয় বুদ্ধিজীবী দেশের জন্য সেনাবাহিনী প্রয়োজন নেই, গণতন্ত্রের জন্য সেনাবাহিনী একটি অভিশাপ কিংবা সেনাবাহিনীর অপ্রতুল আর্থিক বরাদ্দকে আরো কাটছাঁট করার পক্ষে ওকালতি করেন। এদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এরা বাংলাদেশকে নির্বীর্য করে প্রতিবেশী হায়েনার অভয়ারণ্যে পরিণত করতে চায়। এদেশের মাটি, এদেশের জনগণ এদের অন্ন দিয়ে, আলো-বাতাস দিয়ে পুষ্ট করেছে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ দিয়েছে, দিয়েছে সামাজিক মর্যাদা, তৎসত্ত্বেও এরা এদের আত্মা শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এদের লক্ষ্য একটাই, সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে বিশাল বিভেদের দেয়াল সৃষ্টি করে দেশটিকে বিদেশী প্রভুত্বের হুমকির মুখে দুর্বল করে ফেলা।

১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতা ভিনদেশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে যে প্রতিরোধের বহ্নিশিখা জ্বেলেছিল, সেদিন থেকে এদেশে জনগণ ও সেনাবাহিনীর বন্ধন একটা দৃঢ় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু এ বন্ধন আধিপত্যবাদের কৃপাপ্রার্থীদের কাম্য নয়, তারা সব সময় সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চায়। এরা বলে, এরা নাকি সেনাবাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত করেছে, অথচ সেনাবাহিনী পোশাক পরিধান করে খোদ প্রধানমন্ত্রী সেনা সমাবেশগুলোতে রাজনৈতিক মিথ্যাচার ও বিষোদগার করে সেনাবাহিনীকে দলীয়মনস্ক হতে এবং এর পাশাপাশি দেশবিরাগী হতে উৎসাহিত করছে। কিন্তু যতদিন ৭ নভেম্বরের শিক্ষা ও চেতনা আমরা হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হবো, ততদিন এদেশে জনগণ ও সেনাবাহিনীর পবিত্র সংহতিকে কেউ বিনষ্ট করতে পারবে না। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও এক কালের বিদ্রোহী সন্তু লারমা বান্দরবান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য স্থানে সেনাবাহিনীর স্থাপনা গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইতোমধ্যেই অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবহারের বিরুদ্ধে চরম স্পর্ধাভরে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ভূমি প্রতিমন্ত্রী জনাব রাশেদ মোশাররফ বিবিসির কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই ভূমি অধিগ্রহণ তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির নীতিবিরোধী হলে তা বাতিল করা হবে। আমার প্রশ্ন হলো— দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সেনাবাহিনী যদি নিজস্ব স্থাপনা গড়ে তোলার অধিকার না রাখে, তাহলে সে অঞ্চলের উপর আমাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব কতটুকু থাকে? সন্তু লারমার অধিগ্রহণ করা জমির

www.pathagar.com

পরিমাণ নিয়ে ন্যায্য কোনো বক্তব্য থাকলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে পারেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর স্থাপনা বর্ধিতকরণ ও উন্নয়নে কোনোক্রমেই বাধা দিতে পারেন না। সে রকম কিছু করলে দেশদ্রোহিতার অপরাধে সন্তু লারমার বিচার হতে পারে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, সন্তু লারমা প্রয়োজন বোধে তার পুরনো ধারার রাজনীতিতে ফিরে যাবেন বলেও হুমকি দিয়েছেন। এই হুমকি দেয়ার অধিকার তার নেই।

'৭৫-এর ৭ নভেম্বর ছিল ৩ নভেম্বরের কুচক্রীদের পরাস্ত করার অভ্যুত্থান। সেই অভ্যুত্থানের একটা বড় সাফল্য জিয়াউর রহমানের মতো সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতাকে রাষ্ট্রনায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। ৭ নভেম্বরে কেবলমাত্র দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রঘাতী ধারার রাজনীতিকে পরাস্তকারী, এ ধারার রাজনীতির বিরুদ্ধে যথার্থ অর্থে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন এমন নেতৃত্বকেও মূলধারায় নিয়ে এসেছে। মনে রাখতে হবে, এ অভ্যুত্থান ও সংগ্রাম দেশবিরোধী রাজনীতির ধারাকে রুখে দেয় কিন্তু সময়ের দাবি অনুযায়ী দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, সেই অভ্যুত্থান ইতিহাসের একটি গোলযোগ হিসেবেই চিহ্নিত হয়— ইতিহাসের নতুন ধারার জন্ম দিতে পারে না। জিয়াউর রহমানকে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস অনেকেই পেয়েছেন কিন্তু তারা বুঝতে চান না ইতিহাস তাকে অনিবার্যভাবে সময়ের সেনানায়কে পরিণত করেছিল। ১৯৭১ ও ১৯৭৫ জাতির এ দু'টি মাহেন্দ্রক্ষণে জিয়াউর রহমানই সময়ের পুরুষ।

www.pathagar.com

ড. আফতাব আহমাদ

আজকের বাংলাদেশ ও ৭ নভেম্বর এর তাৎপর্য

আবার ফিরে এসেছে ৭ নভেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনে এ গৌরবদীপ্ত দিবসটি লাল হরফে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। ৭ নভেম্বর আমাদের প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের ভাষা। ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের রক্ষাকবচ। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত এ অঞ্চলে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল, ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর এদেশের অকুতোভয় লড়াকু জনতা সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক বীর সিপাহীদের সঙ্গে এক বিরল ও অনন্য জঙ্গী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে তার সমুচিত জবাব দিয়েছিল। আজ আবার আরো গভীরতার তাৎপর্য নিয়ে ফিরে এসেছে সেই ৭ নভেম্বর।

এই দিবসটির তাৎপর্য আজ এক লহমায় বোঝা দুরূহ তো বটেই। এর প্রেক্ষাপটটি যদি আমরা অনুধাবন না করি তা হলে অন্ধের হস্তি দর্শনের মতোই আমরা হরেকরকম অসংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকব।

একবার আসুন আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই কালপন্জি আমাদের অন্তরভেদী দৃষ্টির সামনে মেলে ধরি। আজকাল কথায় কথায় সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে তার সর্বশেষ স্তাবকের স্তোত্রপাঠের সময় ৭২ থেকে৭৫ এর গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগের কথা শুনতে হয়। কেমন ছিল এই স্বর্ণযুগের প্রকৃত স্বরূপ?

মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহায়তায় যে লুটেরা দুর্বৃত্ত শ্রেণী এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তাদেরই শীর্ষ সংগঠন আওয়ামী লীগ এদেশের মানুষের সঙ্গে চরম প্রহসন করে। মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্যের যে পুণ্য ব্রত নিয়ে আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, তাকে অস্বীকার করে ক্রমেই ফুলে-ফেপে বেড়ে উঠেছিল আওয়ামী দুঃশাসনের নরক যন্ত্রণা।

২৫ বছরের শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি নামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে ভারতের কাছে বন্ধক দিয়ে আওয়ামী লীগ রাজ নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার ন্যাক্কারজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার স্বাধীনতাকে হরণ করে গণতন্ত্রের নামে এক পৌত্তলিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়

---

* *বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সহ-সভাপতি এবং দেশের প্রথম বিরোধী দলীয় জাতীয় দৈনিক অধুনালুপ্ত গণকণ্ঠ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী সম্পাদক।*

www.pathagar.com

পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং বিরুদ্ধ মতকে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায় আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী। ৭২ থেকে ৭৫ প্রায় ৪২ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা হত্যা করে। প্রায় ৮৬ হাজার বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীসমর্থকদের কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়। ভারতীয় পরিকল্পনা মোতাবেক এবং ভারতের মদদপুষ্ট জাতীয় রক্ষীবাহিনী ক্ষমতাসীনদের ঝটিকাবাহিনী হিসেবে সারা দেশে আতংক ছড়িয়ে দেয়। আওয়ামী লীগের দালাল সংগঠন মুজাফফরের ন্যাপ এবং মণি সিং এর সিপিবিও আওয়ামী সন্ত্রাস থেকে রক্ষা পায় নি। সিপিবির ওয়ালিউর রহমান লেবুকে ৭৩ এর জাতীয় নির্বাচনের অব্যবহিত পরই গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। একইভাবে মেরে ফেলাহয় ন্যাপ (মো) এর কমলেশ চন্দ্র দাসকে, ছাত্র ইউনিয়নের লুৎফর রহমান মানিক ও শ্যামল ব্যাণার্জিকে। (জনগণ্ঠ, ১১মার্চ ১৯৭৩)। এক কথায় আওয়ামী লুটের গোষ্ঠী সারা দেশে মুজিবী ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করে।

কেমন ছিল এই ফ্যাসিস্ট শাসনের স্বরূপ? আওয়ামী ঘরানার প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০ এর মতে : "ফ্যাসিবাদী সরকার নিজেদের ক্ষমতার অচলায়তন নির্মাণের লক্ষ্যে দমনপীড়ন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই নব উত্থিত যুবশক্তি বিশেষ করে রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চন্ডনীতি বাংলাদেশকে সংঘাতময় করে তোলে। ক্ষমতাসীনদের বিভিন্ন বাহিনী বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে গঠিত আধাসামরিক রক্ষীবাহিনী অন্যদিকে লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মতো কয়েক নামের দলীয় বাহিনীর দমন পীড়ন হত্যা এদেশে রাজনৈতিক হত্যার সূচনা করে। ... রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন আওয়ামী লীগ নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য ঐ হত্যার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। খোদ প্রশাসনের নাকের ডগায় পাবনা শহর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়ায় স্থাপিত ঘোষিত কসাইখানায় রাজনৈতিক বিরোধীদের ধরে এনে হত্যা করা হতো। আর সে সকল হত্যাকাণ্ডের প্রকারও ছিল বিচিত্র ধরনের। বন্দীদের শিং মাছ ভরা টবে চুবিয়ে, গাছের ডালে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে, কোপ দিয়ে মাথা কেটে নিয়ে আরো বিচিত্র উপায়ে হত্যা করা হতো। কথিত আছে কুষ্টিয়ায় ক্ষমতাসীন দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নিহত ব্যক্তির মাথা কেটে থালায় করে দেখাতে হতো। নিয়মিত এই দৃশ্য দেখে তার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। এমনকি জেলখানায় ঢুকে বিরোধীদের তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে এই সময়ে (অনিরুদ্ধ ইসলাম, "২৭ বছরের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড : ঘাতক অনুসন্ধান", মাহফুজ আনাম প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০, ৫ নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ: ২৯)।

www.pathagar.com

এ সকল অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মুক্তিযোদ্ধা স্টুয়ার্ড মুজিব হত্যা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নেভাল সিরাজ হত্যা, সিদ্দিক মাস্টার হত্যা, সাবেক গণপরিষদ সদস্য মোশাররফ হোসেন হত্যা, বিমানের নূর হোসেন হত্যা, গণকণ্ঠের শাহজাদপুরের সংবাদদাতা শহিদুজ্জামান হেলাল এবং জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা বোরহান উদ্দীন রোকন হত্যা অন্যতম। সর্বোপরি সিরাজ শিকদারের হত্যা রাজনীতিতে এক চরম কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই হত্যার রাজনীতিকে রাষ্ট্রীয়করণ দেয়া হয় রক্ষীবাহিনীর হাতে যে-কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ ও আটক করে রাখার মতো ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে।

রাষ্ট্রীয়করণের নামে চলছিল কলকারখানার বেপরোয়া লুটপাট। চোরাকারবারী, কালোবাজারীসহ উৎপাদনবিমুখ সকল কর্মকাণ্ড অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। জনগণ প্রতারণার জন্য লোক দেখানো আওয়ামী ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য সিরাজুল হক (বর্তমান মুজিব হত্যা মামলার সরকারি আইনজীবী) ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ জাতীয় সংসদে বলেন "80% of the sumgglers that have so far been arrested are petty fellows. ... we are to run after big smugglers who were [running] to Dhaka [for their life] and for that matter to the chambers of the big leaders *(জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা ১৬, ১৯৭৪, পৃ. ৯৩০; জনাব হক ইংরেজিতে সংসদে তার বক্তব্য প্রদান করেন, এখানে অবিকৃতভাবেই তাঁর ভাষ্যটি উদ্ধৃত করা হোল)*। তাজউদ্দীন আহমেদ আরো চমৎকারভাবে বলেছেন "পুলিশ যখন চোর, ডাকাত ও হাইজ্যাকারদের গ্রেফতার করে, তখনই মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে বা উচ্চ মহল থেকে তাদের মুক্তির জন্য টেলিফোন আসে।" (গণকণ্ঠ ১১ মার্চ ১৯৭৪)। প্রশাসন, সমাজ ও জাতীয় অর্থনীতির যে পরিণতি আওয়ামীরা ডেকে এনেছিল তার জন্য আওয়ামী লীগ অর্থাৎ AL কে বিদেশীরা Association of Looters বা লুটেরাদের সমিতি অর্থাৎ লুটপাট সমিতি নামে অভিহিত করা শুরু করে। আর তাদের নির্মম নির্যাতনও নিষ্পেষণের জন্য অনেকে AL কে আল্লাহর লানত্ নামেও অভিহিত করা শুরু করে।

গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগে বাংলাদেশের দুর্নীতির চিত্রটিও বেশ বর্ণাঢ্য। ১৯৭৩-এর গোড়ার দিকে খোদ শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলছেন যে, সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত শিল্প লাইসেন্সের মধ্যে ১২৭৭টি ভুয়া (পূর্ব দেশ ৩০ এপ্রিল ১৯৭৩)। বাণিজ্যমন্ত্রী কামরজ্জামান স্বীকার করছেন যে, ২৯০০০ আমদানিকারকদের মধ্যে ১৪০০০ই ভুয়া (হলিডে, ৩ জুন ১৯৭৩)। আরো তথ্য আছে— ৫০% রেজিস্ট্রিকৃত হ্যান্ডলুম ভুয়া (পূর্ব দেশ, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩)। কেবল ৭২-৭৩ এই সময়ের মধ্যে ৬০০০ পরিত্যাক্ত বাড়ি আওয়ামী কর্মীরা বেআইনী দখলে নেয় এবং ৭০০০ বাড়ির অবৈধ মালিকানা লাভ করে (গণকণ্ঠ, ১ জুন ১৯৭৩)।

www.pathagar.com

আদমজীতে ৮০০০ ভূয়া শ্রমিককে নিয়োগদান করা হয় যারা নিয়মিত বেতন পেত (বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ জুন ১৯৭৩)। সূতা কেলেংকারিকে কেন্দ্র করে একটি সরকারি তদন্তে ৩ লাখ ভূয়া তাতী সনাক্ত হয়, কিন্তু দলীয় স্বার্থের খাতিরে তদন্ত রিপোর্ট ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয় (গণকণ্ঠ, ১৪ মে ১৯৭৪)। ১৯৭৩-এর গোড়ার দিকে কেবলমাত্র রাজধানীতে ১২ লাখ ভুয়া রেশন কার্ডের সন্ধান পাওয়া যায়.(গণকণ্ঠ, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩)। এ-সবই আওয়ামী লুটেরাদের অনন্য কৃতিত্ব বটে।

মুজিবী দুঃশাসনে দেশের অর্থনীতির চরম বিপর্যয় ঘটে। চোরাকারবারী এবং চোরাচালানী দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে অর্থনীতির অধঃপতনে সক্রিয় ছিল। আওয়ামী মহিলা সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগমের পৈতৃক নিবাস থেকে অস্ত্রসহ চোরাই পথে আনিত বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী সেনাঅভিযানে উদ্ধার করা হয় (ইত্তেফাক, ১২ মে ১৯৭৪)। ফুলের মতো পবিত্র আওয়ামীদের চরিত্র। আওয়ামী কলামিষ্ট আবেদ খান ঐ সময়ে ১৯৭৩-এ ইত্তেফাক এ চোরাচালানের উপর "ওপেন সিক্রেট" নাম দিয়ে একটি সিরিজ রচনা করেন। সেই সিরিজটিতে আওয়ামী লুটপাটের বহু কাহিনী তুলে ধরা হয়। এমনকি তখনকার বিডিআরপ্রধান বর্তমানে কেন্দ্রীয় পুজা কমিটির সভাপতি তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার সি আর দত্ত যখন মুজিব প্রশাসনের সাফাই গেয়ে দাবি করেন যে, সীমান্তে চোরাচালান ডেড-স্টপ হয়ে আছে, তখনো আবেদ খান তা চ্যালেঞ্জ করেন (ইত্তেফাক, ১৭ নভেম্বর ১৯৭৩; ওপেন সিক্রেট-৯)। সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এর এক হিসেবে দেখা গেছে গড়ে ১৫০০০ বেল পাট চোরাচালানীর মাধ্যমে ভারতে পাচার হতো (গণকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)। ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত ভারতে পাচারকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান এক গবেষণার হিসেবে দাঁড়ায় 8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ টাইমস, ২০ মার্চ ১৯৭৬, W. B. Reddaway and M. M. Rahman, the Scate of Smuggling Out of Bangladesh, BIDS, Research Report No. 21, Dhaka : 1975)।

কেমন ছিল গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগে বাংলাদেশের স্বরূপ? জুলাই ১৯৭৫-এ মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদার মূল্যায়ন করেছেন এভাবে : ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ... স্বচ্ছল কৃষকরা কোন শ্রমদান না করেই আরো ধনী হচ্ছে এবং অধিকতর ভূমির মালিক বনে যাচ্ছে। অপরদিকে ক্ষুদ্র চাষীরা ধীরে ধীরে আরো ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভূমিহীন বেকারে পরিণত হচ্ছে। (Phani Bhushan Mazumdar cited in Socio-Economic Implications of Introducing HYV in Bangalesh, BARD, Commilla : 1975, p.9)।

বস্তুত বাংলাদেশের যে হাল মুজিবী শাসন করেছিল তা চমৎকারভাবে ৭২ এই মোজাফরের ন্যাপ উপলব্ধি করেছিল। মোজাফফল ন্যাপের কার্যকরী কমিটি

www.pathagar.com

১৯৭২-এর শেষ দিকে যে অভিমত ব্যক্ত করে তা প্রনিধানযোগ্য : আওয়ামী লীগ দুর্নীতিকে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত করেছে। (গণকণ্ঠ, ২০ নভেম্বর ১৯৭২)। মুজিবের ক্ষমতালোভী চরম উচ্ছাকাঙ্ক্ষী ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭৪-এর এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী সরকারকে চরম দুর্নীতিবাজ সরকার অভিহিত করে ঘোষণা দেন যে, "আওয়ামী লীগ আজ আর জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করে না" এবং "আওয়ামী যুব লীগ সরকারের দুর্নীতির অংশীদার নয়" (বাংলার বাণী, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)। একই সঙ্গে শেখ মণি এক অভিনব দাবি উত্থাপন করে বলেন, 'দেশ আইনের শাসন চায় না, চায় মুজিবের শাসন। হায়রে গণতন্ত্র!'

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বমুখী লম্ফ, আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার চরম সংকোচন বিষয়ক পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে আমার এই প্রবন্ধকে আমি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি বাংলাদেশকে একটি অবসিত রাষ্ট্র (collapse state)-এর পর্যায়ে উপনীত করে। অব্যবস্থাপনা এবং বেপরোয়া লুণ্ঠন ও দুর্নীতির ফলে ১৯৭৪-এর মানব সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ কমপক্ষে দেড় লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। কী অসাধারণই না ছিল ৭২ থেকে ৭৫-এর গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগটি।

পাশাপাশি খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ এ-সব কিছু নিয়ে কী চমৎকার না ছিল স্বর্ণযুগের গণতন্ত্র এই বাংলাদেশ। তখনকার সামাজিক চালচিত্র অভিনবভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এদেশেরই অনন্য প্রতিভা মহত্তম কবি আল মাহমুদের ভাষায় সোনালী কাবিন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত "বোধের উৎস কই, কোন দিকে?" কবিতাটিতে। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আমারই প্রতিষ্ঠিত বিরোধী দলীয় জাতীয় দৈনিক অধুনালুপ্ত গণকণ্ঠে :

আচ্ছন্ন চিন্তার মধ্যে স্তব্ধতায় অকস্মাৎ শুনি
সেলাই কলের চলা। পড়শী ঘরণী
বানায় শিশুর জামা।
হঠাৎ গুলির শব্দ। চিৎকার, ধর ধর ধর
কিন্তু আমি কাকে ধরবো। স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায়
উনিশ শো তেয়াত্তর সাল।
বাগান মাড়িয়ে দিয়ে জীপ যায়,
আবার গুলির শব্দ,

www.pathagar.com

মা ... মা ... মা ... জানালা বন্ধ করো
টেলিফোন, টেলিফোন
আবার গুলির শব্দ। বাঁচাও, বাঁচাও
বানাও শালাকে ছিঁড়ে ফ্যালো—
ট্যাট ... ট্যাট ... ট্যাট

এই তো স্বর্ণ যুগের গণতন্ত্রের মুখচ্ছবি প্রিয় সজ্জনমণ্ডলী। কী অপূর্ব ৭২ থেকে ৭৫ এর মুজিবী বাংলাদেশ। ত্রাস, সশস্ত্র হামলা, অপহরণ, ধর্ষণ, মাত্রাহীন স্বজন তোষণ ও দুর্নীতি, লুটতরাজ, বেপরোয়া লুটতরাজ, 'ওলটপালট করে দে মা লুটেপুটে খাই' জপমন্ত্রের অহর্নিশ উচ্চারণ, গ্রেফতার, নির্যাতন, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ভয়ংকরী দাপট, রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডব, লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের ঠ্যাংগাড়ে বাহিনীসমূহের পৈশাচিকতা, ১৯৭৩-এর চর দখল ও ভোট ডাকাতির প্রথম প্রহসনমূলক নির্বাচন, কুখ্যাত দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে জরুরি অবস্থার নামে গণঅধিকার হরণের ও গণনিপীড়নের বিধানাবলী বিষয়ক কালো অধ্যায়ের সংযোজন, হত্যা-গুম-খুন-গুপ্তহত্যা উন্মত্ত পিটুনী, সংবাদ পত্র দলন, সাংবাদিক দলন, বিরুদ্ধমতের কণ্ঠরোধকরণ, বিরোধী দলীয় কার্যালয়ে আগুন— এক কথায় মধ্যযুগীয় তান্ডব। এই তো ৭২ থেকে ৭৫-এর চেহারা প্রিয় সজ্জনমণ্ডলী। ঘরের বাইরে গেছে যে সন্তান, মা কি আদৌ জানতেন ফিরে আসবে সেই আদরের দুলাল তাঁরই বুকে? মায়ের এই শংকা প্রকাশিত হয়েছে নির্মল সেনের এই আকুল আকুতিতে— স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই— কী মনমোহিনী রূপই না ছিল স্বর্ণযুগে মুজিবী বাংলাদেশের।

ভারতপ্রীতি শেখ মুজিবকে এমনভাবেই পেয়ে বসেছিল যে, শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে গাটছড়া দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে ১৯৭৪-এর জুলাই মাসে সীমান্ত চিহ্নিত করণের নামে এক চুক্তিস্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দক্ষিণ বেরুবাড়ি দিয়ে দেয়া হয়। সংবিধানের কুখ্যাত তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় বেঈমানির এই চুক্তিটিকে আইনী লেবাস দেয়া হয়। কোনো গণভোট অনুষ্ঠান ছাড়াই বেরুবাড়ির বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতের গোলামে পরিণত করা হয়। কোনোরকম চুক্তি ছাড়াই ফারাক্কার ফিডার ক্যানাল পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে দেয়ার নামে মুজিব গংগার পানির নিয়ন্ত্রণ ভার ভারতের হাতে তুলে দেন। যার পরিণতিতে বাংলাদেশ গংগার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয় এবং পরিবেশগত অভিশাপের শিকার হয়।

ক্ষমতার মৌতাত মুজিবকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার লিপ্সায় পেয়ে বসে। সেনাবাহিনীর একটি কন্টিনজেন্ট দিয়ে সংসদ ভবন ঘেরাও করে (বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫), সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি পদদলিত করে মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এদেশে এক ব্যক্তির

www.pathagar.com

একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে নাগরিকদের সকল মৌলিক-মানবিক ও নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়। নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের শেষ ভরসাস্থল বিচার বিভাগকে দাসানুদাসে পরিণত করে এক দানবীয় ব্যবস্থা এ জাতির বুকে চেপে বসে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা, বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রাখার অধিকার সবকিছুই বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়। বিরোধী দলের বিশিষ্ট নেতা তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান আওয়ামী সরকারকে বিশ্বাস ঘাতক এবং মুজিবকে ফ্যাসিস্ট অভিহিত করে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন : নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হলে বিপ্লব অনিবার্য (গণকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ১৯৭৪)।

১৯৭৫-এর আগস্টের পটপরিবর্তন তাই অনিবার্য ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে যে সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার সুযোগ স্বয়ং মুজিব প্রদান করেছিলেন, সেই সেনাবাহিনী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের বহুদলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী অংশের সক্রিয় সহযোগিতায় মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আনয়ন করে। সমগ্র দেশবাসী এ পরিবর্তন সমর্থন ও অনুমোদন করে। কেউ এর প্রতিবাদ করে নি। আমরা যারা মুজিবী দুঃশাসন নির্যাতনের শিকার হয়ে কারান্তরালে ছিলাম আমরাও স্বস্তিবোধ করেছিলাম। বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়লে রক্তাক্ত পথেই আসে পরিবর্তন। এর জন্যে হায় আফশোস করে লাভ নেই। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আবুল ফজল ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে মুজিবের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন : সঙ্কট মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না (গণকণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪)। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে কিংবা বলশেভিক বিপ্লবের সময়ে কিংবা এই সেদিন রোমানিয়ায় গণতন্ত্রের জোয়ারে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তা ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। যত অমানবিকই হোক, রাজা লুই, রাণী মারি আঁতোঁয়ানেট, জার নিকোলাসও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সস্ত্রীক চচেসকোকে প্রাণ এবং রক্তাঞ্জলি দিয়েই স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র উচ্ছেদের মূল্য শোধ করতে হয়।

আজ মুজিব হত্যার বিচারের নামে রাজনৈতিক জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে ক্ষমতাসীন দল। কিন্তু সেদিন আওয়ামী লীগের অসংখ্য সদস্য ক্ষমতার এই পরিবর্তনকে সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করে খন্দকার মোশতাককে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। মুজিবের জীবিত সন্তানরা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায়— কি মানবাধিকার সংস্থা- কি বিচার বিষয়ক কোনো সংস্থা কোথাও কোনো ফরিয়াদ পর্যন্ত করে নি, আন্তর্জাতিক কোনো

www.pathagar.com

মামলা রুজ্জু করা তো দূরের কথা। উল্টো মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আবদুল মালেক উকিল লন্ডনের বাংলাদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন শোকর আলহামদুলিল্লাহ। দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পেল। মৃত্যুর পূর্বের শেষ দিন পর্যন্ত হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-এর শীর্ষ নেতাদের একজন ছিলেন মালেক উকিল। মোশতাকের বিশেষ দূত হিসেবে মহিউদ্দীন মস্কোকে তদবির করে এসেও মৃত্যুর পূর্বের শেষ পর্যন্ত হাসিনার আওয়ামী লীগের নেতাই ছিলেন। বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সিপাহসালার বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী যিনি মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনিও তাহলে মুজিবের ঘাতকদের একজন। অথচ বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী ১৯৭৮-এ আওয়ামী লীগের সমবায়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী ছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ কী করে তা অনুমোদন করেছিল? এ থেকেই আওয়ামী লীগের ভণ্ডামী ধরা পড়ে।

মোশতাকের ৮৩ দিনের দুর্বল প্রশাসন ভারতীয় চরদের ষড়যন্ত্র করার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ঠিক এই সুযোগটিকেই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের সম্মুখে তুলে ধরে ভারতীয় চরেরা ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘুরাবার অপপ্রয়াস চালায়। তারই অংশ হিসেবে ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থান। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ভারতমুখী অভ্যুত্থান হিসেবে সর্বমহলে যথার্থই চিত্রিত ও চিহ্নিত হয়। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ, বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় চরদের নাশকতামূলক তৎপরতা মুহূর্তের মধ্যে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দেশপ্রেমকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়— যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চমবাহিনী এই অভ্যুত্থানকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। অফিসার বিদ্বেষ ছড়িয়ে সেনাঅফিসারদের হত্যার এক ঘৃণ্য নীল নকশা জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা বাস্তবায়ন করা শুরু করে— যা মুহূর্তের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টগুলোতে সন্ত্রাস ও আতংক ছড়িয়ে দেয়। বহু অভিজ্ঞ নিবেদিত প্রাণ দক্ষ সেনাঅফিসার এই অরাকজতার শিকার হয়ে নিহত হন। আইন-শৃঙ্খলা এবং সেনা শৃঙ্খলা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে ভারতীয় বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানই ছিল এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। সাধারণ সৈনিকদের দেশপ্রেম, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অবদানকে খাটো করার জন্য জাসদের হটকারী ও দুরভিসন্ধিপরায়ন নেতৃত্ব এবং জাসদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা ভারতীয় অনুচরেরা সবকিছুই নিজেদের কৃতিত্ব বলে জাহির করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই বিপ্লবের গৌরব তারা ছিনতাই করতে ব্যর্থ হয়। সাধারণ সৈনিকদের সংহতি এত মজবুত ছিল যে ঘোলাজলে মাছ শিকারের কোনো সুযোগই সেখানে ছিল না। সকল সিপাহী-অফিসার-জনতার কাছে তখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রনায়কোচিতভাবে এবং সাহসের

www.pathagar.com

সঙ্গে এই অরাজক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। তিনি সেনাছাউনীসমূহে ক্ষিপ্রতা ও অতি দ্রুততার সঙ্গে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে অনেকেই ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর অপব্যাখ্যা দাড় করিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন— কিন্তু এতে কোনো ফল হবে না।

৭ নভেম্বরের ঘটনা এক বিরল ও অনন্য ঘটনা। সিপাহীদের উদ্যোগে জাতির পরিত্রাণের উদ্দেশে এ ধরণের পদক্ষেপ ১৮৫৭ সালে ইতিহাস একবার প্রত্যক্ষ করেছিল। ফরাসি বিপ্লবে বাস্তিলের পতনের পর প্যারির লড়াকু মানুষ যেমন ফরাসিদের মানমর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল— ৭ নভেম্বরও শুধু এ-সব অর্জনই করে নি আমাদের জাতীয় চেতনায় একটি নতুন মাত্রাও দান করেছে। বিশিষ্ট জ্ঞান সাধক ড. কাজী মোতাহার হোসেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'আমরা স্বাধীন হয়েছি। তবে সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয়েছি নাকি রাশিয়া বা ভারতের অধীনে রয়েছি, সেটা ভেবে দেখা দরকার' (গণকণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩)। ৭ নভেম্বরে অন্যান্য ঘটনা বাংলাদেশকে রুশ-ভারতের বলয় থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করে এবং সার্বভৌমত্বকে অর্থবহ করে তোলে। আজকের ক্ষমতাসীন চক্রের নেতা যেমন ১৫ আগস্ট দেখেন নি তেমনি ৭ নভেম্বরও দেখেন নি। তাই তিনি এ দেশের মানুষের অনুভূতি বুঝতে অক্ষম। তিনি বুঝতে অক্ষম ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বরের গভীরতা ও তাৎপর্য এবং কী পরম মমতায় মানুষের ভালবাসায় সিক্ত এ দুটি দিবস। এদেশ কারো অনুগ্রহ লাভের জন্য কিংবা কারো করদরাজ্য হবার জন্ম নেয় নি। আমরা পিন্ডির জিনজির ছিন্ন করেছিলাম দিল্লীর গোলামীর জিনজিরকে হার হিসেবে গলায় ধারণ করার জন্য নয়। আমাদের রয়েছে অজেয়-অবিনাশী শক্তি। ৭ নভেম্বর তাই প্রমাণ করেছে। এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হন দেশনায়ক জিয়াউর রহমান।

কেমন মানুষ ছিলেন জিয়াউর রহমান? আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশবাসীকে হতাশা থেকে মুক্ত করে জিয়াউর রহমান বীরত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দান করেন। তিনিই প্রথম বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে, জান যাবে তবুও মান যেতে দেয়া হবে না। হানাদারদের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন প্রতিরোধ তিনি গড়ে তোলেন। আবার ৭ নভেম্বর চরম অরাজকতার দিনে সিপাহী জনতা নির্বিশেষে সকলেই তাকিয়ে ছিল জিয়াউর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বের দিকে। তিনি সাফল্যের সঙ্গেই তাঁর সে দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। অমৃতের সন্তানের মতো সময়ের সাহসী কাজটি জিয়াউর রহমান যথাযথভাবেই করেছেন।

কেমন মানুষ ছিলেন জিয়াউর রহমান? এক কালের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং বর্তমান সরকারের নিযুক্ত ল কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন দেশনায়ক জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে:

www.pathagar.com

"বাংলাদেশের অন্যতম মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মরহুম জিয়াউর রহমান— দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়কের নৃশংস হত্যা জাতির পক্ষে চিরকাল বেদনার স্মৃতি হয়ে থাকবে। তাঁর স্মৃতি আরো বেদনাদায়ক যখন বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করি তাঁর সামরিক শাসন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা। মহাপুরুষের মহত্ব তাঁর কর্মজীবনে, যা কর্মজীবনের প্রভাব উত্তরকালে সম্প্রসারিত হয়। মরহুম জিয়াউর রহমানের বহু স্মরণীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে দুটির উল্লেখ করতে চাই— সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ... জিয়াউর রহমান ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে থেকে তার হানিকর দিক স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি তাই গণতন্ত্রের পথ বেছে নিলেন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত নিঃস্বার্থতা ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি রেখে গেছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের অপূর্ব নিদর্শন... তিনি করেন ক্ষমতার হস্তান্তর অর্থাৎ ব্যক্তির হাত হতে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতার উত্তরণ, সামরিক শাসক হতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। তাঁর এই পদক্ষেপ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রক্ষমতা জন নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। ... মরহুম জিয়াউর রহমান গণতান্ত্রিক অধিকার লংঘন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, কোনো দেশের জনসাধারণ একবার যদি গণতান্ত্রিক মানবাধিকার ভোগ করে তারা কোনো কারণে সে অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, অবশ্যম্ভাবী কারণে অসন্তোষ দেখা দেবে। এই অসন্তোষ যত দিন যাবে, ক্রমে আন্দোলন ও পরিণামে গণবিক্ষোভের আকার নেবে। এই সত্যতা উপলব্ধি করে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং গণতন্ত্রায়ণে উত্তরণে তিনি সার্বজনীন স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পন্থা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ অবলম্বন করেন। ... আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, সামরিক শাসন হতে গণতন্ত্রে উত্তরণ তিনি স্বেচ্ছায় করেন। তার জন্য জনগণকে আজকের মতো কোনো আন্দোলন করতে হয় নি। সেরূপ কোনো আন্দোলন হতো না বলা যায় না, তবে তা হবার পূর্বেই তিনি গণতন্ত্রায়নের পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও গণতান্ত্রিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে এজন্য তিনি চিরকাল শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকবেন।" (রুহুল আমিন সম্পাদিত, জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ এ বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন, "জিয়াউর রহমান ও গণতন্ত্র", ঢাকা : ১৯৯১, পৃ. ৯৭-১০১)।

আজকের বাংলাদেশের স্বরূপ কী? ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই দিল্লী আওয়ামী ক্রীড়নকদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, বাংলাদেশের ভারতভুক্তির প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করা। এই লক্ষ্যে সাউথ ব্লকের কৌশল হচ্ছে বাংলাদেশের ভটানীকরণ সাধন করা এবং পরবর্তীতে একজন বাংলাদেশী কাজী লেন্দুপ দর্জিকে দিয়ে ভাবতীয় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা।

www.pathagar.com

তাই আওয়ামী ক্রীড়নকরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্র্যানজিটের নামে এশিয়ান হাইওয়ের পরিবর্তিত পথের নামে ভারতকে করিডোর প্রদানসহ উপ-আঞ্চলিক জোট, উন্নয়ন ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ-এর নামে ভারতীয় রাষ্ট্রদেহে অঙ্গীভূত হওয়ার, বিদ্যুৎ আমদানির ও অভিন্ন গ্যাস-পাওয়া গ্রিডের নামে ভারত নির্ভর হওয়া এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমনের নামে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নস্যাতের নানা ধরণের কৌশলী প্রস্তাব উত্থাপিত হতে আমরা দেখছি। বস্তুত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বস্ত গবেষক বি.জি ভার্গিজের এথনিসিটি এন্ড ইনসারজেন্সি ইন দি নর্থ ইস্ট গ্রন্থটিতে বিশদভাবে এই পরিকল্পনাগুলো সন্নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থটি রচনার কাজ শেষ হয় ১৯৯৪-এ, যন্ত্রস্থ হয় ১৯৯৫-এ এবং প্রকাশিত হয় ১৯৯৬-এর প্রথমদিকে। আর্থিক মুনাফার নামে ভারতীয় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে চায়। অর্থাৎ বন্দরটির নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চায়। ছোট ছোট চুক্তির মাধ্যমে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির চাইতে আরো অধীনতামূলক ও সর্বনাশা চুক্তি এ পদলেহী সরকার সম্পাদন করে যাচ্ছে একের পর এক। চরম গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে নিজ দলকে পাশ কাটিয়ে সংসদকে তোয়াক্কা না করে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা চুক্তির নামে এক অধীনতামূলক চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয় এবং পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিকে বিসর্জন দেয়া হয়। নব্য আপারটাইট নীতির ভিত্তিতে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত্র চুক্তিটির বলে দেশের এক দশমাংশ কার্যত ভারতের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি গুজরালের নেতৃত্বে ভারতীয় চক্র চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সমন্বয়ে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠনের নামে মূলত: বাংলাদেশকে খণ্ড বিখণ্ডকরণের একটি প্রস্তাব সক্রিয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করে যান। এদেশীয় দালালরা তারই ডুগডুগি বাজাচ্ছে এখন। সবকিছুরই লক্ষ্য এক— বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ভারত দেহে লীন করার আয়োজন করা।

কেমন বাংলাদেশে আজ আমরা বসবাস করছি? হামলা, মামলা, হত্যা, খুন, ধর্ষণ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে ক্ষমতাসীনদের মাস্তানদের দ্বারা ধর্ষণ জারি রাখা, বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের ঢালাও গ্রেফতার করা ও হুলিয়া জারি করা, বিরুদ্ধাবাদিদের নির্মূল করা আজ প্রাত্যহিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। জুতার ফিতা গলায় দিয়ে থানার হাজতে তরুণ আত্মহত্যা করে। পুলিশের এই অপদার্থ অংশটির মস্তিষ্ক উর্বরই বটে। সীমা চৌধুরীকে পুলিশ ধর্ষণ করে ক্ষান্ত হয় নি, পরে হত্যাও করেছে এবং হত্যার আলামতসমূহ ধ্বংসও করেছে। মাসুম শিশুকে হাজতে খোদ পুলিশ ধর্ষণ করছে। থানার হাজত থেকে বন্দিকে বের করে মন্ত্রীর পুত্র ধোলাই অভিযান চালাচ্ছে। এসি আকরামের মতো দানবরা রুবেলের মতো মেধাবী ছাত্রদের জীবন প্রদীপ নির্বাপনে ব্যস্ত। গণপ্রতিনিধিদের কারানির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। সরকারপ্রধানের স্বামীর মতে এদেশ বাসের অযোগ্য।

www.pathagar.com

দাবি করা হয় দেশে আইনের শাসন রয়েছে। কেমন আইনের শাসন? বিচারকদের ধমকানো এখন একটি মামুলি ব্যাপার— যেমন ধমকাত সরকারপ্রধানের জন্মদাতাও। দেশের কোনো নাগরিকের কোনো অধিকার নেই। মুজিবী দুঃশাসনে বিমানের নূর হোসেনকে যেভাবে হত্যা করা হয় ১৯৭৪-এ এবার তার চাইতেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বিমানের শরিফকে। একজনকে চোর ছিনতাইকারী কিংবা হেরোইন আসক্ত বলে চিহ্নিত করতে পারলেই বিচারের প্রয়োজন হয় না, গণপিটুনির দ্বারা হত্যা করা এখন আইনসিদ্ধ। তা না হলে একজন নিরীহ আব্বাসের হত্যাকে কেন্দ্র করে সরকারপ্রধান কীভাবে দম্ভ করতে পারেন। সিরাজ শিকদারের হত্যাকারীদের অন্যতম আত্মস্বীকৃত সরকারপ্রধানও সেদিন জাতীয় সংসদে দম্ভের সঙ্গে এমনি পাপোচ্চারণ করেছিলেন "কোথায় সিরাজ শিকার?"

একটি মামলার রায় কী হবে তা তো নির্বাহী বিভাগের জানার কথা নয়। কিন্তু তার পূর্বেই সরকারপ্রধান নির্দেশ জারি করেছেন— রাজপথ দখলে রাখ- কোথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা? রাজপথ দখলে রেখে বিচারককে রক্তচক্ষু দেখিয়ে এবং ভীতি প্রদর্শন করে মনসই রায় আদায় করাই কি এর উদ্দেশ্য নয়? অন্যদিকে সকলের আড়ালে হাইকোর্ট ডিভিশনে নির্বাহী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিচারকদের অপদস্থ করার উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে এবং বিচার ব্যবস্থাকে একটি প্রহসনে পরিণত করার সব আয়োজন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি সম্পন্ন করে এনেছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অর্থানুকূল্যে এদেশে বহু পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে। জনমতকে ভারতমুখী করে তোলাই যে এর উদ্দেশ্য তা বলাই বাহুল্য। পারমানবিক অস্ত্রের অধিকার হয়ে ভারত বাংলাদেশকে ব্ল্যাক মেইল করছে— যার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীন কোনো পররাষ্ট্রনীতি আর পরিদৃষ্ট নয়। আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোফা স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় নি কেবলমাত্র ভারতীয় রক্তচক্ষুর কারণে। আজ বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশের সঙ্গে আমাদের গভীরতর সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। সার্ককে যদি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে রাখতে হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশকে ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে সার্ক-এ অন্তর্ভুক্ত করা খুবই জরুরি। কিন্তু দিল্লীর কৃপাপুষ্ট এ পরজীবী গোষ্ঠী দিল্লী তোষণের বাইরে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে যত্নবান নয়।

৭ নভেম্বর আত্মপ্রত্যয়ের দিন, নবজাগরণের দিন। ৭ নভেম্বর মানে মাথা নত না করা। আজ ৭ নভেম্বরের চেতনায় আমাদের পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় বেঈমানের মোকাবেলা করার নতুন অঙ্গীকার করতে হবে। অতীতাশ্রয়ী রাজনীতির দিন ফুরিয়ে গেছে। প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা আর খুচিয়ে খুচিয়ে পুরনো ঘাকে ক্ষতে পরিণত করলে শেষ পর্যন্ত না তা প্রাণসংহারী গ্যাংরীনে রূপ লাভ করে। দর্পী শাসক গোষ্ঠীর একথা স্মরণে রাখা উচিত।

www.pathagar.com

ড. কে এ এম শাহাদাত হোসেন মণ্ডল

৭ নভেম্বর ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব

বিশ্বের কমবেশি সব জাতির ইতিহাসই কিছু কিছু দিন স্বতন্ত্র মর্যাদায় অবিস্মরণীয় এবং ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে জাতি প্রেরণার উৎস এবং ঐক্যের প্রতীক হিসেবে দিনগুলোকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৭ নভেম্বর তেমনি এক অনন্য দিন—'জাতীয় বিপ্লব দিবস'।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ৭ নভেম্বর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ইতিহাস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সিপাহী-জনতা বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছিল। জনগণ ফিরে পেয়েছিল গণতন্ত্র ও বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার। স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী সরকারের দুঃশাসন, গণতন্ত্র হত্যা ও একদলীয় শাসন 'বাকশাল' গঠন, ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি সিপাহী-জনতার মহান বিপ্লবের উদয়।

The Bangladesh Times-এর জনাব আহমদ ফজলের ভাষায়—"November 7 is a landmark in the post independence history of Bangladesh. It signifies the undimming dividing line between a period of instability and uncertainly and that of confidence, firm leadership and stability. It marks the anniversary of the new nation's victory in the struggle for consolidating independence, safeguarding sovereignty and protecting integrity (*The Bangladesh Observer*, 7. 11. 93)."

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে দেশ ও জাতি আওয়ামী দুঃশাসন থেকে রক্ষা পেলেও একটি মহল ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। বাংলাদেশকে একটি তাঁবেদারী রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল এই চক্রান্তকারীদের মূল লক্ষ্য।

'৭৫-এর নভেম্বরের প্রথম দিন থেকেই দেশের পরিস্থিতি টালমাটাল অবস্থায় চলে যায়। সরকারি কর্মকাণ্ডে নেমে আসে এক ধরনের অঘোষিত স্থবিরতা। পর্দার অন্তরালে ঘটতে থাকে অনেক ঘটনা, রাষ্ট্রবিরোধী অনেক ষড়যন্ত্র। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। ক্যু পাল্টা ক্যু-এর এক পর্যায়ে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সংঘটিত হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দুঃখজনক জেল হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে

www.pathagar.com

চেইন অব কমান্ড চরমভাবে ভেঙে পড়ে। সমগ্র দেশ অন্ধকারে নিপতিত হয়। দেশবাসীর জানমালের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

দেশের জনগণ যখন দিশেহারা, তখন আওয়ামী লীগের ছাত্র ও সমর্থক রাস্তায় নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার তারা মুজিব দিবস হিসেবে পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শহীদ মিনারে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল বের হয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। ... তারপর ৭ নভেম্বর শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশে শোকসভার অয়োজন করে। এ-সব কারণে জনগণের মনে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভ্যুত্থানের (৩ নভেম্বর খালেদের অভ্যুত্থান) সূচনা হয় বলে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ... সর্বোপরি তারা যখন আবিষ্কার করল, আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্বে দিচ্ছেন, তখন তারা বুঝে নেয় যে, তার (খালেদ) অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত আর আওয়ামী লীগ জড়িত— এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠানো হয় জেনারেল জিয়াকে আটক করার জন্য। তারা তার বাড়িকে সকল যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জিয়াকে তার হল ঘরে আটকে রাখে (সূত্র: এ লিগেসি অব ব্লাড— এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, পৃষ্ঠা-১০৫-১০৬)। খালেদ মোশাররফ তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

কিন্তু দেশ ও জাতির এই সঙ্কটের উত্তরণ ঘটেছিল বীর জনতা ও আমাদের অকুতোভয় সেনাবাহিনীর জোয়ানদের সম্মিলিত সাহসী উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে। এই দিনে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার চেতনাকে আরো এক ধাপ পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিয়েছে ৭ নভেম্বরের এই বিপ্লব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

কিন্তু '৭৫-এর ৭ নভেম্বর তারা সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করার গৌরবও অর্জন করল। এ এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সিপাহী-জনতা সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে বেরিয়ে এসেছিল। ঢাকার রাস্তায় নেমেছিল আনন্দ মিছিল। সকালবেলা সৈনিকরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাজপথে হাজার হাজার মানুষ তাদের অভিনন্দন জানায়। চেতনার ঐক্য কীভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে ৭ নভেম্বর তার প্রমাণ।

যে জনগণ ৩ থেকে ৭ নভেম্বরের সূর্যোদয় পর্যন্ত ছিল বাকরুদ্ধ, বিপন্ন স্বাধীনতার প্রশ্নে উৎকণ্ঠিত, তাদের কণ্ঠে বুলন্দ আওয়াজ উঠল— 'নারায়ে

www.pathagar.com

তকবির, আল্লাহু আকবার'; 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' *(সূত্র: কাজী সিরাজ, দৈনিক দিনকাল, ০৪-১০-১৯৯৮)*।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এ বিষয়ে তার 'লিগেসি অব ব্লাড' গ্রন্থে লিখেছেন— "উল্লসিত কিছু সৈনিক আর বেসামরিক লোক নিয়ে কতগুলো ট্যাঙ্ক ঢাকা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়। এবার ঐ ট্যাঙ্ক দেখে লোকজন ভয়ে না পালিয়ে ট্যাঙ্কের সৈনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

চারদিন ধরে তারা মনে করেছিল, খালেদ মোশাররফকে দিয়ে ভারত তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খর্ব করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এতক্ষণে তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেল।

জনতা সৈনিকদের তাদের ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দিত করল। সর্বত্রই জোয়ান আর সাধারণ মানুষ খুশিতে একে অপরের সাথে কোলাকুলি শুরু করে। রাস্তায় নেমে রাতভর শ্লোগান দিতে থাকে— আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণের মতো জনমত আবার জেগে উঠেছে।

এটা ছিল সত্যিই একটা স্মরণীয় রাত।" বাংলাদেশের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য এক জাগ্রত উপলব্ধির মতো সেদিন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এবং মানুষের মনে নতুন করে মুদ্রিত হয়েছিল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার দৃপ্ত শপথ।

৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভূতপূর্ব বিপ্লবের মাধ্যমে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন বীর মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং স্বাধীনতা-যুদ্ধকালের মতো পুনরায় দেশের হাল ধরেন। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৭ নভেম্বরের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৯৭৫ সালের ঐদিনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষকের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। তিনি সে সময় ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বন্দি ছিলেন। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সেদিন জিয়াকে মুক্ত করে জনতার মাঝে নিয়ে আসে। জিয়াকে সামনে রেখে সিপাহী-জনতা সংহতি সেদিন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যে অঙ্গীকার করেছিল, বাংলাদেশের দিকনির্দেশনায় তার ভূমিকা চির অম্লান হয়ে আছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়া জাতির আর এক দুঃসময়ে এসে দেশের হাল ধরলেন। মুক্তিযোদ্ধা এবার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ব্রতী হলেন *(দৈনিক বাংলা, ০৭-১১-৯৩)*।

তার এই দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে চেইন অব

www.pathagar.com

কমান্ড ফিরে আসে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়।

আজ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেদিন যদি ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব না হতো, তাহলে দেশের অস্তিত্বই আজ থাকত না— থাকত না আমাদের স্বাধীনতা। এ-দেশ ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হতো। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেত না।

গৃহযুদ্ধের রক্তবন্যায় দেশের মাটি রঞ্জিত হতো। এক কথায় বলা যায়, দেশের অস্তিত্বের পাশাপাশি জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার পথ রচিত হয় এই দিনে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জরুরি আইন প্রত্যাহারের সাথে সাথে আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে রাজনীতি করার অনুমতি প্রদান করেন।

দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে তিনি প্রায় ১০ হাজার বন্দি রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই জিয়া বাকশাল পরবর্তী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে শূন্যতা পূরণ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐক্য এবং সর্বোপরি উৎপাদনমুখী একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল'— বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর।

বস্তুত, বিএনপির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জিয়াউর রহমান দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের বিধিনিষেধ না থাকায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা নিয়ে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর মহান বিপ্লবের মাধ্যমে শুধু দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি— দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি নবজীবন লাভ করে। দেশবাসীর জন্য অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা বিধান করেন। শুরু হয় স্বাধীন জীবনের পরিপূরক উৎপাদন আর উন্নয়নের নতুন রাজনীতির ধারা। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিসঞ্চার হয়েছিল। দেশে কৃষি বিপ্লব, গণশিক্ষা বিপ্লব এবং শিল্প উৎপাদনের বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য দেশে ১৪শো খাল খনন করা হয়। গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪০ লাখ নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়। হাজার হাজার মাইল রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়।

প্রায় ২৭ হাজার ৫শো পল্লী চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়। দেশে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে নতুন

www.pathagar.com

নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। তিন শিফটে কাজ করে শিল্পোৎপাদনের জোয়ার আসে। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দেশ খাদ্য রফতানির পর্যায়ে উন্নীত হয়।

উদ্যোক্তা ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের রফতানি বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ তার কলঙ্ক 'ভিক্ষার ঝুড়ি'র অপবাদ মুছে ফেলতে সক্ষম হয়।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে তাই অসীম। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভাষায় বলতে হয়, "সংহতি ও বিপ্লব দিবসের শিক্ষা আমাদের নিবেদিতপ্রাণ জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক জনগণকে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য নতুন "বিপ্লব'-এর উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে প্রেরণার উৎস এবং নতুন মহিমান্বিত 'বিপ্লব'-এর পূর্ণ সাফল্যের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, ত্যাগ ও ঐক্য অপরিহার্য।" বাংলাদেশের সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষায়—

"৭ নভেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। ৭ নভেম্বর বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে বহুদলীয় গণতন্ত্র, বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন এবং শাণিত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতায় ভাগ্নোদ্যম হতাশ জাতি সেদিন উদ্দীপ্ত হয়েছিল স্বপ্নে ও কর্মে।

এদেশের বীর জনগণের কাছে ৭ নভেম্বরের চেতনা হচ্ছে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও গণতন্ত্র নিরাপদ রাখার রক্ষাকবচ। সকল আগ্রাসন, চক্রান্ত, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের প্রতিটি সংগ্রাম, আন্দোলন ও স্পন্দনে ৭ নভেম্বর প্রেরণার উৎস।" *(দৈনিক দিনকাল, ০৭-১১-১৯৯৭)*।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জিয়া দেশকে অরাজকতা ও ভারতীয় হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে গত ১৬ অক্টোবর '৯৮ ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ঘটনাবলীর সময় ঢাকায় ব্রিগেড অধিনায়ক এবং ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের দক্ষিণ হস্ত কর্নেল শাফায়াত জামিলের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তার ভাষায়—

"জিয়া সেদিন সেনাবাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে জিয়া তখন দেশকে সামগ্রিক অরাজকতার হাত থেকে যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখেন। জাসদের গণবাহিনীর ইন্ধনে সৈনিক সংস্থার নামে কর্নেল তাহের সেনাবাহিনীর পদবী তুলে দেয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেন। এ সময় অনেক সেনা অফিসারকে

www.pathagar.com

নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই বিদ্রোহ ছিল সেনাবাহিনী ও দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত।

গণবাহিনী ও সৈনিক সংস্থার পরিকল্পনা ছিল সেনা অফিসারদের হত্যার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কিছু বুদ্ধিজীবী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে এসে অরাজকতা নিরসন করে শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাতেন এবং পুলিশ অ্যাকশনের নামে ভারতীয় হস্তক্ষেপ হয়ে যেত।

জিয়া এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে দৃঢ়তার সাথে তা মোকাবিলা করেন। জিয়া দেশপ্রেমিক সৈনিকদের বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে পুরো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন। সৈনিকদের সহায়তায় তিনি কর্নেল তাহেরের বিদ্রোহ প্রশমন করেন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ তিন বাহিনীর মধ্যে পদবী অক্ষুণ্ন রাখেন। এভাবেই জিয়া সেনাবাহিনী ও দেশকে রক্ষা করেন।" *(দৈনিক দিনকাল, ২০-১০-১৯৯৮)*।

এ-কথা আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সবকিছুই সম্ভব হয়েছে '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার যৌথ বিপ্লবের জন্য। কারণ সেদিন যদি এই বিপ্লবের নামে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্ত না হতেন, তাহলে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বধীনতার সূর্য অস্ত যেত ভারতীয় গগনে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত হলেও চরম দুর্ভাগ্যজনক যে, আজ ২৪ বছর পর তা আবার হুমকির সম্মুখীন। দেশের ভেতরের ও বাইরের শত্রুরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ভারতীয় আগ্রাসন বাংলাদেশকে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে 'অক্টোপাস'-এর মতো জড়িয়ে ধরেছে— এর হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে চাই একটি বিপ্লব ও সংগ্রাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ভারত তাদের আপনজন আওয়ামী সরকারের সহায়তায় বেরুবাড়ি, তালপট্টি পেয়েছে।

এছাড়া তথাকথিত শান্তিচুক্তির আড়ালে ভারতীয়দের স্বার্থ তাদের মদদপুষ্ট সন্ত্রসীদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী দেশের এক-দশমাংশ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামকে অদূরভবিষ্যতে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার বীজ বপন করা হয়েছে।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে সংখ্যালঘুদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আগে বাংলাদেশের নাগরিক হোন' উক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি চিত্তরঞ্জন সূতার ও অপর নেতা ডা. কালিদাস বৈদ্যের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের নামে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে ভারতীয়

www.pathagar.com

মদদে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টায় নতুন করে লিপ্ত হয়েছে *(দৈনিক দিনকাল, ২৫-১০-১৯৯৯)*।

ভারত ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা আইন লঙ্ঘন করে দুরভিসন্ধিমূলক পদেক্ষপ নিয়ে সিলেটের ১০ বর্গমাইল এলাকা দখল করে নিয়েছে *(দৈনিক দিনকাল, ১০-০১-১৯৯৯)*। মুহুরী নদীতে বাঁধ দিয়ে চর সৃষ্টি করে কৌশলে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভারত একের পর এক দখল করে নিচ্ছে *(দৈনিক দিনকাল, ১৯-১০-৯৯)*।

এ-ছাড়া দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোল সীমান্ত এখন কার্যত খুলে দেয়ায় এই অঞ্চলে জাতীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি হুমকির সম্মুখীন।

বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন শত শত ভারতীয় নাগরিক এক রকম বিনা বাধায় বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। *(দৈনিক দিনকাল, ২২-১০-১৯৯৯)*। এ-ছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সীমান্তে ৩০ কি. মি. পর্যন্ত পদ্মা নদীর উপরে শতকরা ১শো ভাগ এবং মহানন্দা নদীর শতকরা ৭৫ ভাগের উপর ভারতীয়দের কর্তৃত্বই প্রমাণ করে এই সীমান্তে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন।

এটা সত্য যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ সীমান্ত আইনকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে আসছে। গত ৪০ মাসে বিডিআর-বিএসএফ-এর মধ্যে ২৫৫টি সংঘর্ষ ঘটে এবং এতে তিনজন বিডিআর সদস্যসহ ৭১ জন বাংলাদেশী নিহত ও ৮২ জন আহত হয় *(দৈনিক দিনকাল, ২৭-০৯-১৯৯৯)*।

বিএসএফ-এর সাম্প্রতিক আগ্রাসী তৎপরতায় বাংলাদেশের সীমান্তের ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিরাজ করছে ভীতিকর পরিস্থিতি। বৃহত্তর সিলেট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, হালুয়াঘাটও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার বাংলাদেশী নাগরিকরা সন্ত্রস্ত দিনযাপন করছে।

এ-সব এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দার বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ ফেলে পালিয়ে অন্যত্র চলে যাবার খবর ইতোমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে শত শত একর বাংলাদেশী ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কেটে নিয়ে যাচ্ছে ক্ষেতের ফসল, ধরে নিয়ে যাচ্ছে গবাদিপশু।

আমাদের বিডিআর জোয়ানরা সাধ্যমত বাধা দিয়ে চলেছেন ভারতীয়দের। কোথাও ঠেকাতে পারছেন, কোথাও কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। দেশের সীমান্ত রক্ষায় তারা প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হচ্ছেন মৃত্যুর। *(দৈনিক দিনকাল, ১৭-১০-১৯৯৯)*।

এ-কথা সত্য যে, সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ-এর তৎপরতা দেশবাসীকে বিস্মিত ও শঙ্কিত করে তুলেছে। সর্বোপরি বিপন্ন করেছে বাংলাদেশের অস্তিত্ব।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে সরকারের রহস্যময় নীরবতা দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। উপরন্তু বর্তমান সরকার ভারতকে ট্রান্সশিপমেন্টের নামে করিডোর প্রদানের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

আধিপত্যবাদী শক্তির কবলে পড়ে আজ বাংলাদেশ তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে ৭ নভেম্বরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বে চলমান দেশরক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। উপেক্ষা করতে হবে তাঁবেদারদের দমন-নিপীড়ন ও অপপ্রচার।

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই বিকশিত হবে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের মূল চেতনা। কারণ যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকবে, বীর জনতা সজাগ থাকবে, তত দিন ৭ নভেম্বর বেঁচে থাকবে তার অপার মহিমা ও কালজয়ী আদর্শ নিয়ে।

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান

চির ভাস্বর সৈনিক জনতা সংহতি

২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ইথারে ভেসে আসা সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠের আওয়াজের কথা আজও যখন শুনি তখন গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, মাথা নত হয়ে আসে পরম শ্রদ্ধায় আর কৃতজ্ঞ চিত্তে তার জন্য বুকের ভেতর দোয়া আসে— "আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাতবাসী কর"।

হ্যাঁ, সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নতুন বাংলাদেশের প্রণেতা শহীদ জিয়াউর রহমানের কথা বলছি। যদিও আজ কিছু স্বার্থন্বেষী মহল ইতিহাসকে বিকৃত করে শহীদ জিয়ার অবদানকে খাটো করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের সদাজাগ্রত আপামর জনগণ সেই অপচেষ্টাকে ধিকৃত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। জনতার রায়ে আজ শহীদ জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় মুকুটবিহীন সম্রাট হিসেবে, স্বাধীন জাতির অনুপ্রেরণা হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অক্ষয়, অব্যয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরস্থায়ী একটি জায়গা করে নিয়েছেন।

এই সেই নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্ব যাকে কুচক্রী গোষ্ঠী বিদেশী স্বার্থে ষড়যন্ত্র করে সেনাবাহিনীপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গৃহান্তরীণ করে রাখে। ১৯৭৫ সালে ৩ নভেম্বরে খবরটি ছড়িয়ে পরার পর সমগ্র বাংলাদেশ বোবা হয়ে গিয়েছিল পরের তিন দিনের জন্য। সেনাছাউনিগুলো এই খবর পাওয়ার পর বিষাদের গোরস্থানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রগতির শত্রুরা কিছুটা উল্লসিত হয়েছিল বটে কিন্তু জনসমক্ষে তা প্রকাশ করার সাহস পায় নি গণরোষে পড়ার ভয়ে। ইতোমধ্যে দেখা গেল জিয়াকে বন্দি করার ষড়যন্ত্রের প্রণেতার প্রতি গণরোষের ইঙ্গিত। দেখতে দেখতে রোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ল নগরে, বন্দরে, মাঠে ও ঘাটে।

ষড়যন্ত্রের বৈধতা নিয়ে নানান প্রশ্ন ও আলোচনা শোনা গেল অফিসে, বাসায়, কলে-কারখানায় এবং মাঠে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি প্রলয়ঙ্করী গণবিস্ফোরণ ঘটল। একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ বিরাজ করছিল তখন। সেনা ছাউনিগুলোতে মনে হচ্ছিল হাহুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসকে সম্বল করে গোটা জাতি দিনাতিপাত করছিল। কেউ কেউ আবার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল দেশ ও জাতিকে বিদেশ প্রসূত ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করার জন্য।

গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে ষড়যন্ত্রমুক্ত করার জন্য ৭ নভেম্বর সেনাবাহিনী বিপ্লব করল, এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য লাখ লাখ লোক বাঁধভাঙা স্রোতের মতো নেমে পড়ল রাজপথে। সৈনিক-জনতার এই

www.pathagar.com

সংহতির দৃশ্য দেখে ৩ নভেম্বরের ষড়যন্ত্রের হোতারা নিরাশ হলো এবং জীবন রক্ষা করার জন্য পালিয়ে গেল। আজ তারা বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। ইতিহাস আবার প্রমাণ করল ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহত্তর মঙ্গলের প্রচেষ্টার কাছে পরাজিত হবেই হবে। ৭ নভেম্বর '৭৫ স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

এরপরের ইতিহাস দেশ ও জাতির উন্নয়নের ইতিহাস। সৈনিক জনতা সংহতি তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করে দেশ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করল। দেশের সার্বিক অবস্থা তখন ধ্বংসমুখী ছিল। আর্থ-সামাজিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল আর আইন-শৃঙ্খলা নৈরাজ্যের বিভীষিকায় বিদগ্ধ হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্বের শূন্যতা দেশকে গ্রাস করতে চলছিল। নিরাশার তমসায় ঘেরা এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে চলমান করা একটি আকাশচুম্বি পরিকল্পনা বইতো আর কিছু নয়।

কিন্তু এই ক্ষণজন্মা পুরুষটি অসীম সাহস ও গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে নেমে পড়লেন নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। তিনি একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করিয়ে বাস্তবায়ন করলেন। আমার মনে হয় এমন কোনো উন্নয়নের কর্মকাণ্ড নেই যেখানে তার অবদান নেই। তিনিই বিরাজমান একদলীয় শাসনতন্ত্র পরিহার করে বহুদলীয় গণতন্ত্র আনয়নে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহিলা এবং যুবকরা দেশের জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ এবং এদেরকে যদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে উন্নয়নের ধারা বেগবান হবে।

এই লক্ষ্যে তিনি মহিলা ও যুব মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করলেন এবং এইসব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে যুবকদের কর্মক্ষম করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের জন্য কর্মসংস্থান করেন।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পুলিশ ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আধা-সামরিক বাহিনীগুলোকে যুগোপযোগী করে পুনঃবিন্যাস করেন এবং তাদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধার করেন। এরই কারণে এই পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী আন্তরিকভাবে তৎপর হয়ে তৎকালীন নৈরাজ্যময় অবস্থা থেকে দেশে একটি আশাপ্রদ স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনে।

মুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ক্রমাবনতির পথে ধাবিত নৈরাজ্যজনক চলমান আর্থিক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি বেগবান ও উন্নয়নমুখী আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া শুরু করিয়েছিলেন। আজও বাংলাদেশের মানুষ ভুলেনি 'বাকশাল' সৃষ্টির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসন প্রবর্তন করার কথা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার কথা, জাতীয়

www.pathagar.com

রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কথা। সৈনিক জনতা কর্তৃক আসীন প্রেসিডেন্ট জিয়া ছিলেন উদার প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। তিনি ভাবলেন জনতার আবেগ, জনতার বিচারক্ষমতা এবং আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা দেখানো একজন প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসীর গুরু দায়িত্ব। তাই প্রেসিডেন্ট জিয়া বাকশাল কর্তৃক হরণকৃত বহুদলীয় গণতন্ত্র জনগণকে ফিরিয়ে দিলেন। বাকশাল স্থান পেলো ইতিহাসের পঙ্কিল আঁস্তাকুড়ে। এরই আওতায় আওয়ামী লীগ পুনর্জীবন পেল। বলা যায় বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া।

সংবাদপত্র ফিরে পেল তাদের কাঙ্ক্ষিত বাক স্বাধীনতা। বাকশালের ষড়যন্ত্রের শিকার নির্বাক জনতা আবার সবাক হলেন। বাকশালী একনায়কত্বের বিভীষিকা দেখে পৃথিবী থমকে গিয়েছিল। অনেক দেশ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে ইতস্তত করছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়া কার্যভার গ্রহণ করার পর একটি সুদূরপ্রসারী বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করলেন এবং পৃথিবীর সব দেশের সাথে একটি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়লেন। তার ব্যক্তিত্বের এতই প্রভাব ছিল যে, রাতারাতি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তাকে অন্যতম প্রথম সারির নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বের বহু দ্বিজাতিক ও বহুজাতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাকে দিয়েছিল যা তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সমাধান করে বাংলাদেশ-কে পৃথিবীর বুকে একটি গর্বিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরশ্রীকাতর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্ট জিয়ার এবং বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলেন। ৩১ মে ১৯৮১ কালজয়ী জিয়া শাহাদৎ বরণ করলেন গুটিকয়েক কুলাঙ্গার ষড়যন্ত্রীর হাতে।

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের সৈনিক জনতার সংহতির কারণে যে বিপ্লব ঘটেছিল তার তাৎপর্যের অন্বেষণে অবতারণা করা হলো উপরোক্ত অধ্যায়ের। যদি সেইদিন সৈনিক জনতা এক হয়ে বিপ্লব না ঘটাত তা হলে আজ হয়তো-বা আমরা আরেকটি সিকিম হয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতাম।

৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা দাসত্বের দাবানলে ভস্ম হয়ে যেত। প্রজন্ম আমাদের ধিক্কার দিত আর দাসত্বের অবসাদে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আত্মাহুতি দিত। পৃথিবীর বুকে যদি আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হতে হবে।

শহীদ জিয়াই সর্বপ্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠান করেন। কেনন্মা তিনি তার দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া হয়, তাহলে প্রতিবেশী দেশের ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ কোনো একদিন আমাদের তাদের অংশ হিসেবে ভাবতে পারে।

www.pathagar.com

আজ আমরা তার দূরদর্শিতার খানিকটা প্রমাণ পাচ্ছি কেননা পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে বাংলা করতে যাচ্ছে। যেই দিন সরকারিভাবে নামটির পরিবর্তন হবে তখন ওরা বলবে আমরাও বাঙালি। সেই সময় আমাদের অস্তিত্ব কি থাকবে?

আমাদের আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ এবং অনাগত ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ ৭ নভেম্বরের সৈনিক জনতার বিপ্লবের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে কেননা সেদিন যদি বিপ্লব না ঘটত এবং শহীদ জিয়াকে যদি ক্ষমতায় আসীন না করা হতো তাহলে আজ আমরা বাঙালি হিসেবে ওপার বাংলার সাথে হয়তো-বা এক হয়ে যেতাম এবং পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে হারিয়ে যেতাম পৃথিবীর বুক থেকে।

তাই তো ৭ নভেম্বরে যে সৈনিক জনতার সংহতির সৃষ্টি হয়েছিল তাকে আমরা আজও ধরে রাখতে, লালন করতে বদ্ধপরিকর। চির অম্লান হোক, চির ভাস্বর হোক ৭ নভেম্বরের সৈনিক জনতার সংহতি।

www.pathagar.com

শাহ আহমদ রেজা

১৯৭৫-এর নভেম্বর : রাজনীতির দুটি ধারা

১৯৭৫ সালের ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। সেই পাঁচটি মাত্র দিনের প্রথম পর্যায়ে চিহ্নিত একটি মহলের উদ্যোগে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন ও ধ্বংস করার ভয়ংকর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনীর মিলিত উদ্যোগ নস্যাৎ করে দিয়েছিল চক্রান্তকারীদের দেশবিরোধী সকল আয়োজনকে।

দেশ কাঁপানো সে পাঁচ দিনের ঘটনাপ্রবাহে যাওয়ার আগে এর পটভূমি সম্পর্কে জেনে নেয়া দরকার।

'৭৫ সালেরই ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল জুনিয়র অফিসারের উদ্যোগে সংঘটিত অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল ও দুঃখজনক মৃত্যু ঘটেছিল। শেখ মুজিবের সহকর্মী ও মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছিলেন, নতুন মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়েছিল শেখ মুজিবের মন্ত্রীদের সমন্বয়ে। দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল, কিন্তু জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয় নি। মেজর জেনালের কে এম শফিউল্লাহকে অবসর দিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীপ্রধানের পদে নিযুক্তি দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র ক্ষমতার উপরিভাগে বা সরকারের প্রকাশ্য পরিচিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও নতুন প্রেসিডেন্ট মোস্তাক মুজিব প্রবর্তিত বাকশালী গভর্নর প্রথা বাতিল করে এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আসসালামু আলাইকুম, খোদা হফেজ ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ দিয়ে সরকারের চরিত্রে ইসলামমুখী পরিবর্তন সূচিত করেছিলেন। চালের দাম প্রতি সেরে চার টাকা করে নেমে এসেছিল এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বাকশালের একদলীয় শাসন-নির্যাতনে অতিষ্ঠ দেশবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসতে শুরু করেছিল। এক কথায়, দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল নতুন এক সম্ভাবনার উদ্দেশে।

সম্ভাবনাময় সে পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। গোপনীয়তার সঙ্গে ভেতরে ভেতরে কাজ গুছিয়ে নেয়ার পর '৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পদচ্যুত ও বন্দি করেন এবং নিজেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনীপ্রধানের পদটি দখল করেন। যে-কোনো বিশ্লেষণে এটি অবৈধ অভ্যুত্থান হলেও সে সময় যেমন, পরবর্তীকালেও তেমনি একথা প্রচার করা হয়েছে যে, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা তথা চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশেই খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছেন।

সেনাবাহিনীর ভেতরে চেইন অফ কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরলেও পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানটি রাজনৈতিক পরিচিতি পেয়েছিল এবং সঠিকভাবেই শেখ মুজিব তথা বাকশালপন্থী অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র তিন দিন। কিন্তু শেখ মুজিবের ছবিসহ মিছিল এবং অন্যান্য কারণে 'এই তিন দিনেই সারাদেশের জনগণের চিন্তা-ভাবনা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হতে থাকে। সাধারণ মানুষ খালেদ মোশাররফের ক্যুদেতাকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করতে থাকেন। তারা ধরে নেন যে, খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে মুজিববাদীরা ক্ষমতায় ফিরে আসছে। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, খালেদ মোশাররফের পিছনে ভারতের আশীর্বাদ আছে। এই রকম বিশ্বাস সৃষ্টি হবার পিছনে কতকগুলো কারণও আছে। ... একই সময় ভারতের রেডিও এমনভাবে খবর প্রচার করে যাতে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, ভারত খালেদ মোশাররফের ক্যুদেতাকে সমর্থন করেছে। সকলেই ধরে নিল, খালেদ মোশাররফ বাকশালপন্থী ও ভারতপন্থী এবং জিয়া বাকশাল-বিরোধী ও ভারত-বিরোধী। (হায়দার আকবর খান রনো, 'মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম', ১৯৮২, পৃ. ১৭৭)।

আওয়ামী-বাকশালীদের সার্বিক তৎপরতার মধ্যদিয়েও একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। '৭৫-পরবর্তী রাজনীতির প্রতিটি পর্যায়েও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানকে দলীয় উদ্যোগ বা আওয়ামী লীগ সমর্থিত পদক্ষেপ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। শোক প্রকাশ করা হয়েছে অভ্যুত্থানকারীদের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য। এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ দৃষ্টান্তটি স্থাপিত হয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর: '৭৬ সাল থেকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত ৭ নভেম্বরের ছুটিকে বাতিল করা হয়েছে এবং এ দিনটিকে 'সৈনিক ও অফিসার হত্যা দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ঘটনা থেকেও একথা প্রমাণিত হয় যে, সেনাবাহিনীর ভেতরে শৃঙ্খলা বা চেইন অফ কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতো যুক্তি উপস্থিত করা হলেও খালেদ মোশাররফ প্রকৃতপক্ষে বাকশালীদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনায় দেখা যাবে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের উদ্দেশ্য ছিল খন্দকার মোস্তাক আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকারকে উৎখাত করে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি চার বাকশাল নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী এবং এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে নতুন একটি সরকার গঠন করা। এ জন্যই সেনাবাহিনী প্রধানের পদ দখল করলেও খালেদ মোশাররফ নিজেকে সরকার প্রধান বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা দেন নি।

কিন্তু দুটি কারণে খালেদ মোশাররফের সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ট্যাংক বাহিনীর সমর্থনে আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়কদের প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে ৬ নভেম্বরের আগে তিনি বঙ্গভবনের দখল নিতে পারেন নি। দ্বিতীয় কারণটি ছিল আরো মর্মান্তিক। সেনানিবাসে সংঘটিত অভ্যুত্থানের পরদিনই কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়েছিল বাকশালের ঐ চার নেতাকে।

বঙ্গভবন দখলে অত্যধিক বিলম্ব ঘটায় সকল দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন খালেদ মোশাররফ। ঢাকা সেনানিবাস, তেজগাঁ বিমান বন্দর এবং রেডিও স্টেশন দখল করতে পারলেও শাহবাগ ও পিজি হাসপাতালের সামনের অংশ থেকে বঙ্গভবনসহ রাজধানীর বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়কদের নিয়ন্ত্রণে। সম্মুখযুদ্ধ এবং সমঝোতার দুটি পথ খোলা ছিল সে সময়। বিবদমান উভয় পক্ষই সমঝোতার পথে পা বাড়ান এবং সেই সমঝোতা অনুসারে আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়কদের দেশত্যাগ করতে দেয়া হয়। খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন ৬ নভেম্বর। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাককে গ্রেফতার করা হয়, বাতিল করা হয় তার মন্ত্রিসভা। প্রবল বিরোধী জনমত এবং চার বাকশাল নেতার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে খালেদ মোশাররফের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসে। তিনি প্রধান বিচপারপতি আবু সাদাত মুহম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন করেন। সেদিনই সন্ধ্যায় রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে বিচারপতি সায়েম জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার ঘোষণা এবং নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দেশের সম্মানিত প্রধান বিচারপতিকে সামনে এনে ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রচেষ্টা চালালেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। এই ব্যর্থতার জন্য তিনি নিজে যেমন দায়ী ছিলেন, তেমনি দায়ী ছিল তার বাকশাল ও ভারতপন্থী হিসেবে প্রাপ্ত পরিচিতি। ঢাকা ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলসহ একদল অফিসারের সমর্থন পেলেও খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানকে, বিশেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ দখলের ঘটনাকে সৈনিক থেকে অফিসার পর্যন্ত কোনো পর্যায়েই ভালো চোখে দেখা হয় নি। জিয়াউর রহমানকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করার পদক্ষেপও নিন্দিত হয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও বীর-উত্তম উপাধিপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে সেনাবাহিনী প্রধান হন নি। স্বাধীনতার পর থেকে তিনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান ছিলেন এবং সেই হিসেবে আইনসম্মতভাবেই তাকে সেনাবাহিনীপ্রধান করা হয়েছিল। সুযোগ এবং

www.pathagar.com

দেখানোর মতো কারণ থাকা সত্ত্বেও জিয়া গ্রেফতার করেন নি বিদায়ী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহাকে।

জিয়াকে হত্যা না করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিলেও নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদক্ষেপের কারণে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও মারাত্মকভাবে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়েছিলেন খালেদ মোশাররফ। সর্বব্যাপী দুর্নীতি, তীব্র রাজনৈতিক নিপীড়ন ও হত্যা, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, সীমান্তে সীমাহীন চোরাচালান ও ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তিসহ মাত্রাতিরিক্ত সুসম্পর্ক এবং সবশেষে বাকশালের নামে একদলীয় ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কারণে শেখ মুজিবের শাসনকালকে জনগণ দেশের এক কালো অধ্যায় হিসেবে মনে করত। সেকালের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যাবে বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খান রনোর বর্ণনা থেকে: '১৯৭৫ সালে শেখ মজিব বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট কায়দায় এক ব্যক্তির জঘন্যতম স্বৈরশাসন প্রবর্তন করেন। জনগণ মনেপ্রাণে এই সরকারের পতন কামনা করছিল। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাকে উৎখাত করার কোনো পথ ছিল না। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই সরকার উৎখাত হলো। ... কিন্তু জনগণ তখন এতই মুজিব বিরোধী ছিল যে, তারা এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে। ... গোটা সামরিক বাহিনীও তা সমর্থন করে বা মেনে নেয়। ... বেশিরভাগ বিরোধীদল খুশিই হয়েছিল।' (রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭)।

গণবিরোধী এবং জনগণের প্রত্যাখ্যাত সেই মুজিব সরকারের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে তাই জনমত প্রবল হয়ে উঠেছিল, পরিস্থিতি দ্রুত চলে গিয়েছিল খালেদের বিরুদ্ধে। হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন, 'সকলেই ধরে নিল, খালেদ মোশাররফ বাকশালপন্থী ও ভারতপন্থী এবং জিয়া বাকশাল বিরোধী ও ভারত বিরোধী। সবাই হয়ে উঠল জিয়ার পক্ষে এবং খালেদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে দেখা গেল সমস্ত মানুষ উত্তেজনায় কাঁপছে। খালেদ মোশাররফের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। তারা সবাই কামনা করছে ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বে জিয়া জয়লাভ করুন।' (রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯)।

'পরদিন (৭ নভেম্বর) সকালে হাজার হাজার ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। তারা সিপাহীদের ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ট্রাক, বাস ও ট্যাংকের উপর সামরিক পোশাক পরিহিত সিপাহী ও সাধারণ মানুষ একত্রে শ্লোগান দিচ্ছে। ঢাকা শহর সিপাহী-জনতার উৎসবমুখর মিছিল আর মিছিলে ভরে গেল। এ যেন জনতার এক মহা বিজয় উল্লাস। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য আমরা আর কোনোদিন দেখি নি। জনতার পাশে দাঁড়িয়ে সঙ্গীনধারী সিপাহীরা আকাশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে— হাজার হাজার গুলি। কিন্তু জনতা ভয় পাচ্ছে না। ঐ গুলি তো বিপ্লবের জয়ধ্বনি।' (রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-৮৪)।

www.pathagar.com

এভাবেই সফল সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান। বন্দি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত ও সেনাপ্রধানের পদে পুনর্বহাল করা হয়েছিল মধ্যরাতেই, খালেদ মোশাররফকে পদচ্যুত করে ব্রিগেডিয়ার পদে নামানো এবং সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রাখার পাশাপাশি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদমর্যাদাও দেয়া হয়েছিল। '৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লব শান্তি ও স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলেও সেদিনই শুরু হয়েছিল সার্বভৌমত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল আবু তাহের বীর-উত্তম। জাসদের সঙ্গে যুক্ত কর্নেল তাহের সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ-এর বর্ণনার ভিত্তিতে এই মর্মে একটি প্রচারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্ট নেয়া হয়েছে যে, মূলত তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনীর অঙ্গসংগঠন সৈনিক সংস্থার উদ্যোগে ও নেতৃত্বেই ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ তেমন কোনো তথ্যকে সমর্থন করে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে দুটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। এক, প্রচারণায় বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের সভায় জিয়াকে মুক্ত করে কর্নেল তাহেরের বাসায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে মুক্ত জিয়া সরাসরি চলে গিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর সদর দফতরে এবং কর্নেল তাহেরই বরং সেখানে গিয়ে জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাছাড়া বন্দি অবস্থায় থেকে জিয়া কীভাবে তাহেরের সাহায্য চেয়েছিলেন— (বলা হয়, জিয়া টেলিফোনে তার জীবন 'বাঁচানোর আবেদন' জানিয়েছিলেন) এবং সাহায্য চাওয়ার মতো অবস্থায় তাকে রাখা হয়েছিল কি না এ প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। (রনো, পৃ. ৪৯৬)।

দুই, কর্নেল তাহেরকে কৃতিত্বদানকারী বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খান রনোর নিজের একটি বর্ণনাও দাবিটির অসারতাকে তুলে ধরে। ৭ নভেম্বরের পরিস্থিতি বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: 'মোস্তাকের ছবি নিয়ে বেশ কয়েকটি মিছিল হয়েছে। জাসদ ও গণবাহিনীর এক তরুণ কর্মী মোস্তাকের ছবির ব্যাপারে আপত্তি জানাতে গেলে জনগণ ও সিপাহীদের হাতে অপদস্থ হয়। একজন সিপাহী রেগে গিয়ে বলে, 'এ নিশ্চয় মুজিববাদী।' কর্মীটি বলে, 'না, আমি মুজিবাবদী নই। আমি আপনাদের পক্ষের লোক। আমি গণবাহিনীর লোক।' জবাবে সিপাহীটি বলে, 'গণবাহিনী? গণবাহিনী কি? নিশ্চয়ই ... মুজিববাহিনীর লোক।' অর্থাৎ সাধারণ সিপাহীদের কছে গণবাহিনী পরিচিত ছিল না ...।' (রনো, পৃ. ১৮৫)।

৭ নভেম্বরের সফল বিপ্লবের জন্য কর্নেল তাহের, জাসদ কিংবা গণবাহিনীকে কৃতিত্ব দেয়ার আগে এ ধরনের ঘটনা ও তথ্যের কথা মনে রাখা

www.pathagar.com

প্রয়োজন। সেদিনের বিপ্লবে কর্নেল তাহের ও তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনীর আংশিক ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই ভূমিকার উদ্দেশ্য ও ফলাফল ছিল নেতিবাচক, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সেনাবাহিনীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

অত্যন্ত অন্যায় হলেও ৭ নভেম্বরের দিনটি থেকেই জিয়াসহ সাধারণভাবে অফিসার মাত্রের বিরুদ্ধেই সৈনিকদের উত্তেজিত করা হয়েছিল এবং এর ফলে দেশের সকল সেনানিবাসেই অসহায়ভাবে নিহত হয়েছিলেন বেশকিছু অফিসার। কর্নেল তাহের ও তার সৈনিক সংস্থার উদ্যোগে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌছলেও জনপ্রিয় জিয়ার প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল কয়েক দিনের মধেই। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যখন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা ছাড়া জিয়ার জন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। '৭৫-এর ২৪ নভেম্বর গ্রেফতার করার পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষে তাহেরকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় '৭৬-এর ২১ জুলাই।

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের অন্য কোনো একটি ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগ্রামের মতো প্রক্রিয়ার সূচনা না করে কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে অফিসার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের মারাত্মক ভুল ও হঠকারী কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে বাস্তবে কর্নেল তাহের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকেই বিপন্ন করার ভয়ংকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার এই হঠকারিতার সমালোচনা করেছেন এমনকি বামপন্থীরাও। (রনো, পৃ. ১৯১-২০০)।

কর্নেল তাহের ও তার অনুসারীরা আরো অনেকভাবেই দেশকে বিপন্ন ও ভারতের হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারকে অপহরণ করার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়। '৭৫-এর সেই বিশৃঙ্খল ও অশান্ত দিনগুলোর মধ্যেও ২৬ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের ছোট ভাইসহ চারজন ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে হাইকমিশনার সমর সেনকে অপহরণের চেষ্টা করেন। গুলি বিনিময়কালে দুজনের মৃত্যু ঘটে, আহত হন হাইকমিশনার।

এই ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ উস্কানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ওপর ভারতের আক্রমণকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা। এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময় সীমান্তে আগে থেকেই সশস্ত্র তৎপরতা চলে আসছিল এবং দেশের অভ্যন্তরে সামরিক হস্তক্ষেপের উপলক্ষ খোঁজা হচ্ছিল। কর্নেল তাহেরের ভাই ও অনুসারীদের এই উদ্যোগটির উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত খোলামেলা এবং সে কারণেই একদিকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলে জিয়া যেমন সেনাবাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জনগণকে সচেতন করতে পেরেছিলেন তাহেরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে।

www.pathagar.com

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ শেষে তাঁই তাহের সমর্থক বামপন্থী নেতাকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, 'এই কারণেই কর্নেল তাহেরের ফাঁসির সময় কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় নি।' (রনো, পৃ. ১৯৪)।

৭ নভেম্বরের সফল সিপাহী-জনতার বিপ্লব প্রসঙ্গে আলোচনাকালে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তা হলো— এ জন্য শুধু প্রধানত নয়, এককভাবেও জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীকালে তার দল বিএনপিকে দায়ী করা হয়। অথচ ঘটনাপ্রবাহের যে-কোনো বিশ্লেষণে দেখা যাবে, যেমনটি একটু আগেও বলা হয়েছে জিয়ার উত্থান ঘটেছিল ঘটনাক্রমে। বাকশাল ও শেখ মুজিববিরোধী অভ্যুত্থান ছিল বলে মুজিবপন্থী জেনারেল শফিউল্লাহকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন আগস্টের নায়করা। জিয়াকে সেনাবাহিনীপ্রধান করা হয়েছিল এ জন্য যে, তিনি আগে থেকেই উপপ্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জিয়ার এই পদোন্নতিরই অন্যরকম ব্যাখ্যা দেয়া হয়, অথচ সেই তারাই আবার কোনো দোষ বা অপরাধ খুঁজে পান না ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের— যিনি সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায় সেনাপ্রধানের পদ দখল করেছিলেন, মেজর জেনারেলের পদোন্নতি নিয়েছিলেন এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার। এই মহলটি এখানো শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ব্রিগেডিয়ার না বলে বেআইনীভাবে মেজর জেনারেলই বলেন খালেদ মোশাররফকে।

এমনি ধরনের চিন্তা ও মনোভাবের বিকাশ ঘটেছে আসলে আওয়ামী-বাকশালী তথা মুজিবপন্থী ধ্যান-ধারণার ভিত্তি থেকে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ যেহেতু মুজিবপন্থী অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন, সেই হেতু তাকে সম্মান করতে হবে এবং কোনো অন্যায় খোঁজা যাবে না তার। কর্নেল তাহেরকেও সম্মানের আসনে রাখতে হবে কারণ, মুজিববিরোধী অভ্যুত্থানের ধারায় আগত জেনারেল জিয়াকে উৎখাতের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। একটি মানসিকতার কারণে এই তথ্যটিও প্রসঙ্গত এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে কর্নেল তাহের ছিলেন আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী। এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হিসেবে দেখা হয় তার জিয়াবিরোধী পরিচিতি ও ভূমিকাকে।

এই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মূলত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার এবং সমুন্নত রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমিকা রাখলেও সেনাবাহিনীর সব সময়ের অবস্থান সাধারণভাবে গেছে জিয়া এবং পরবর্তীকালে বিএনপির অনুকূলে— যাকে আওয়ামী-বাকশাল ও মুজিববিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে কারণেই সেনাবাহিনীকেও সব সময় সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে, এমনকি নানা যুক্তিতে দেশে সেনাবাহিনী রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের অন্য একটি দিককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তারা উল্লেখ করতে চান যে, জিয়ার আগে ও পরে

www.pathagar.com

সেনাপ্রধানের পদে আগত সকলেই অবসর জীবনে বিএনপি বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত হয়েছেন। দুই অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শফিউল্লাহ ও নূরুদ্দিন খান আওয়ামী লীগে গেছেন। একমাত্র জেনারেল (অবঃ) আতিকুর রহমান সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এদিকে সর্বশেষ সেনাপ্রধান (অবঃ) নাসিম কেন ও কোন দলের স্বার্থে অভ্যুত্থান করেছিলেন— সে কথা সম্ভবত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

এ-সব তথ্যের প্রেক্ষিতেই পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, '৭৫ সালের ৭ নভেম্বর পরাজয় বরণের পর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার ও ক্ষেত্রবিশেষ নিন্দিত করার মাধ্যমে ধ্বংস করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেই প্রচেষ্টা এখনো গোপনে চলমান রয়েছে। কিন্তু তারপরও পর্যবেক্ষকদের গভীর বিশ্বাস, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কোনো পর্যায়েই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যাবে না, কারো উস্কানি বা প্ররোচণায়ই সেনাবাহিনী দাঁড়াবে না জনগণের স্বার্থবিরোধী অবস্থানে। ধ্বংসও করা যাবে না জনসমর্থিত এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে।

www.pathagar.com

হারুনুর রশীদ

কর্নেল তাহের কি "বঙ্গবন্ধু" প্রেমী ছিলেন?

৭ নভেম্বর বিএনপি'র মতে 'বিপ্লব ও সংহতি দিবস'। জাসদ এক সময় এ দিবসকে বলত 'সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান বা বিপ্লব দিবস' (আওয়ামী লীগের পশ্চাদনুসারী হওয়ার পর তাদের আগের স্ট্যান্ড এখন আর বলবৎ নেই)। আওয়ামী লীগের মতে, এই দিবস কী দিবস কে জানে? তবে এ দিবস তাদের দৃষ্টিতে যে অত্যন্ত ঘৃণ্য, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলেও এই দিবসটি বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে বহাল ছিল। খালেদা জিয়ার আমলে তো ছিলই। দেশের ডানপন্থী দলসমূহও এদিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে এ জন্য যে, ৭ নভেম্বরের ঘটনা না ঘটলে তাদের অনেকেরই পুনরুত্থান হয়তোবা সম্ভবপর হতো না।

কিন্তু একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে এ দিনের সরকারি ছুটি বাতিল করে দিল। কারণ, তাদের বিচারে যাই-ই বিএনপির জন্য ইতিবাচক, তাই-ই তাদের জন্য নেতিবাচক হতে বাধ্য। তা ছাড়া, ৭ নভেম্বরের ঘটনা আওয়ামী বাকশালের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে যে নস্যাৎ করে দিয়েছিল এটা তো সন্দেহাতীত।

বিএনপি ও অন্যান্যরা ৭ নভেম্বরের ছুটি বাতিল মানবে কেন? অতএব ৭ ও ৮ নভেম্বর ঘোষণা করা হলো হরতাল। এটা অবধারিত যে, আওয়ামী লীগ যত দিন ক্ষমতায় থাকবে তত দিন ৭ নভেম্বর হরতাল হবেই এবং আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষরা আবার কোনো দিন ক্ষমতায় গেলে এদিন পুনরায় সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষিত হবে এবং দিবসটি সরকারিভাবেও উদ্‌যাপিত হবে। সশস্ত্র বাহিনীসমূহের মেসেও এদিন আয়োজন হবে বড় খানার।

বাংলাদেশে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব একবারেই অনুপস্থিত বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। এদেশে সবাই ইতিহাস লেখেন ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ অনুযায়ী। আওয়ামী লীগ পন্থীদের লিখিত ইতিহাস ও বিএনপি পন্থীদের লিখিত ইতিহাসে কোনোই মিল নেই। জামায়াতে ইসলামী কোনোদিন ক্ষমতায় গেলে যে ইতিহাস লেখা হবে, হয়তো সেটাও হবে এক অভিনব ব্যাপার। তিন রকমের ইতিহাস পড়ে পাঠকদের পিতাদেরও সাধ্য হবে না সত্যকে খুঁজে বের করবার। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন, ৭ নভেম্বরের ক্ষেত্রেও তেমনি ইতিহাসের এই বিড়ম্বনা সমভাবেই প্রযোজ্য।

বিএনপি পক্ষীয়রা ৭ নভেম্বরকে এমনভাবে উদ্‌যাপন করেন যেন এর কৃতিত্বটা জিয়াউর রহমানেরই। কিংবা ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানটা একেবারেই স্বয়ংক্রিয় বা স্বয়ংসিদ্ধ। কিংবা এটা জিয়াপন্থী সিপাহীদেরই কাজ। কিন্তু আমরা

www.pathagar.com

যারা ৭ নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলাম, তারা তো জানি, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ রাতে কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের সামান্যতম কোন ধারণাও ছিল না, ভূমিকা তো দূরের কথা। জিয়াউর রহমান তাঁর জীবনকালে কখনোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ দিবসটিকে তাঁরই কৃতিত্ব বলে দাবি করেন নি। তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, ২ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাঁকে (জিয়াউর রহমানকে) যখন গৃহবন্দি করে ফেলে, তখন তিনি বস্তুত মৃত্যুরই দিন গুনছিলেন। তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে, খালেদ মোশাররফ তাঁকে হত্যা করবেই। ৭ নভেম্বর পরবর্তী ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল যে, ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২-০১ মিনিটে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং রাত দুটার দিকে কর্নেল তাহের (অবঃ) তাঁর বাসভবনে গেলে জিয়া কর্নেল তাহেরকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "You are my brother, you are my saviour". তুমি আমার ভাই, তুমি আমার রক্ষক। জিয়া নিজেও একথার সত্যতা আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন। অথচ দুঃখের বিষয়, বিএনপি ও অন্যান্য আওয়ামী বিরোধীরা যখন এ দিনটি উদ্যাপন করেন, তখন তাঁরা জাসদ ও কর্নেল তাহেরের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করনে না। তাঁরা হয় ৭ নভেম্বরের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না অথচ তাঁরা ভয় করেন যে, ৭ নভেম্বরের কৃতিত্বের অংশ কর্নেল তাহের বা জাসদকে দিলে জিয়াউর রহমান খাটো হয়ে যাবেন। সত্য কি কাউকে কখনো সত্যিই খাটো করে? মিথ্যা বা সত্য গোপনের ভিত্তির ওপর কি কখনোই গড়ে ওঠে মহত্ত্বের ইমারত?

বস্তুত, ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের পূর্ণ কৃতিত্বটাই ছিল জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার এবং তার নেতা কর্নেল আবু তাহের বীরোত্তম-এর। তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সব সিপাহীই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ছিল না। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সিপাহীরাই নিয়েছিল বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সিদ্ধান্ত। সেনাবাহিনীর অন্য কারোরই এরকম কোনো চিন্তা বা সিদ্ধান্ত ছিল না। লরেন্স লিপসুজ লিখিত 'বাংলাদেশ: দি আনফিনিশড রিভল্যুশন' নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, যা কেউ কখনোই চ্যালেঞ্জ করেন নি, করার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পর সেনাবাহিনীর অনান্যরা (যেমন, জেনারেল জিয়ার প্রতি অনুগত, খন্দকার মোস্তাকের প্রতি অনুগত এবং ভারতীয় আগ্রাসনবাদ বিরোধী সিপাহীরা) স্বতঃস্ফূর্ত ও বিপুলভাবে অভ্যুত্থানে যোগ না দিলে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার একার পক্ষে এই অভ্যুত্থান সফল করা আদৌ সম্ভবপর হতো কি না সন্দেহ। এই বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের ফলশ্রুতিতেই জেনারেল জিয়া মৃত্যুর দুয়ার থেকে ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। ধূলিসাৎ হয়ে যায় স্বৈরাচারী এক দলীয় বাকশাল পুনরুজ্জীবনের সকল সম্ভাবনা। উন্মুক্ত হয় বহু দলীয়

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের পথ, বাকস্বাধীনতার পথ, আগ্রাসনবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পথ। পাশাপাশি, এ-কথাও ঠিক, সেদিন জেনারেল জিয়াউর রহমানই সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আগ্রাসনবাদকে রুখে দিয়েছিলেন এবং আপামর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ব্যতিত আর কারো পক্ষেই সেদিন এই ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাই যদি ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের হোতা হয়ে থাকে, তাহলে তার ফলশ্রুতিতে জাসদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো না কেন? প্রশ্নটা খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আলোচনা। তবে সংক্ষেপে এটুকু শুধু বলা যায় যে, সেদিন নিজেদের ভুল ও হঠকারিতার জন্যই জাসদ এই বিপ্লবের ফসল তাদের ঘরে তুলতে সমর্থ হয় নি। জাসদ নেতৃত্বের সংশ্লিষ্ট অংশটি যদি তখন গণসচেতনতা ও বাস্তব অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারতেন এবং সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিতেন, তাহলে জাসদ এভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ত বলে আমি মনে করি না। তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা জাসদেরই করায়ত্ত হতো। দলের, এমনকি গোপন দলের নিয়ম-শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করে ২/৪ জন নেতার সিদ্ধান্তে কী প্রয়োজন ছিল মহিলা অফিসারসহ সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে হত্যা করবার এবং অফিসার হত্যাকে শ্রেণীসংগ্রামের অংশ বলে ঘোষণা করে ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে লিফলেট ও পোস্টার ছড়িয়ে দেবার? ৭ নভেম্বর ভোরে যে জেনারেল জিয়া সম্পর্কে শ্লোগান দেয়া হয়েছিল “কমরেড জিয়া কমরেড জিয়া— লাল সালাম লাল সালাম”— তার ৪৮ ঘণ্টা যেতে না যেতেই কী প্রয়োজন ছিল জেনারেল জিয়াকে শ্রেণীশত্রু আখ্যায়িত করে তাঁর সরকারকে উৎখাত করার জন্য মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রব স্বাক্ষরিত লিফলেট প্রত্যেক সেনাছাউনিতে বিলি করবার? কী প্রয়োজন ছিল ২৮ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য সরলপ্রাণ দুঃসাহসী কর্নেল তাহেরকে দিয়ে পুনরায় উদ্যোগ নেয়ার? (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২৮ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত জওয়ানদের সঙ্গে পরিকল্পনারত অবস্থাতেই কর্নেল তাহের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের জনৈক হাউস টিউটরের বাসা থেকে ধরা পড়েন, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত সদস্যরাও এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন বিধায় নিয়মমাফিক মামলাটি বিচারের জন্য মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে যায় এবং বিশ্বের প্রতিটি ব্যর্থ ক্যু-এর নায়কের ভাগ্যে যা ঘটে, কর্নেল তাহেরের ভাগ্যেও তাই ঘটে— অর্থাৎ তাঁর ফাঁসি হয়)। কী প্রয়োজন ছিল, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে অপহরণ করার নাটকের অবতারণার? এসবের ফল হয়েছে এই যে, যে জাসদ এক সময় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলত, সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব অনুযায়ীই হঠকারি ও নৈরাজ্যবাদীদের

www.pathagar.com

যে পরিণতি হওয়ার কথা, জাসদেরও তাই-ই হয়েছিল, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল দার্শনিক বাকুলিন-এর মানসপুত্র নেচায়েভ, জালিয়াবভ প্রমুখের নেতৃত্বাধীন রুশ নৈরাজ্যবাদীদের ক্ষেত্রে। শোনা যায়, যে কজন নেতা তৎকালীন মূল সংগঠনের স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত বা পার্টি শৃঙ্খলার কোনো ধার না ধেরে হঠকারিভাবে এই কাণ্ডগুলো ঘটিয়েছিলেন এবং জাসদের মতো একটি উদীয়মান শক্তিকে ছত্রখান করে দিয়েছিলেন, তাঁরা নাকি এখন আর এর কোনো দায়-দায়িত্বই স্বীকার করেন না।

বিএনপি দু-দুবার বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল। এখনো বিএনপি বাংলাদেশের দু-প্রধান রাজনৈতিক শক্তির এক শক্তি। ফলে জাসদ, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা বা কর্নেল তাহেরের মূল্যায়ন করার কোনো প্রয়োজনই হয়তো বিএনপি'র নেই। আওয়ামী লীগ যেমন ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব "বঙ্গবন্ধু"-র ওপর আরোপ করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তেমনি বিএনপি'র অনেকেও বোধহয় ৭ নভেম্বরের সমস্ত কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানের ওপর অথবা তাঁর ভাবমূর্তির ওপর আরোপ করে দিতে আগ্রহী। বেগম খালেদা জিয়া নিশ্চয়ই জানেন, সত্য ঘটনা কী?

৭ নভেম্বরের ব্যাপারে বিএনপি'র আচরণ যত না বিস্ময়কর তার চেয়ে শতগুণ বিস্ময়কর খোদ জাসদের আচরণ। অবশ্য ১৯৭৫-এর জাসদের সঙ্গে বর্তমানের জাসদের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান। তৎকালীন জাসদ ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা নিরঙ্কুশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কায়েমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি সংগঠন। আর বর্তমান জাসদ জনগণের দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের এক নগণ্য লেজুড় মাত্র।

বস্তুত, ১৯৭২ সালে জাসদ গঠিত হয়েছিল তৎকালীন আওয়ামী স্বৈরাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ হিসেবে। বিপ্লবের টগবগে প্রতিমূর্তি যে আ.স.ম. আবদুর রব ১৯৭৪ সালে প্রকাশ্যে জনসভায় শেখ মুজিবের পিঠের চামড়া তুলে লবণ লাগিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন এবং পার্লামেন্টকে একটি নোংরা জীব বিশেষের খোয়াড় বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই আ.স.ম. আবদুর রবই এক পর্যায়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে ভিড়ে গৃহপালিত বিরোধী দল-এর নেতা হিসেবে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। এবং বাংলাদেশের গত ২০০ বছরের ইতিহাসে এরশাদের মতো মহান নেতার আবির্ভাব ঘটে নি বলে ঘোষণা করেন; আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সেই আ.স.ম. আবদুর রবই আবার ২০০ বছরের অতুলনীয় নেতা এরশাদকে ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভিড়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, 'বঙ্গবন্ধু'ই এদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাইরে থাকলে তার লাশের ওপর দিয়েই নাকি 'বঙ্গবন্ধু'কে হত্যা করতে হতো। আগাগোড়া এতোই বঙ্গবন্ধু ভক্ত ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

সকলেরই স্মরণ আছে, ১৯৭২-৭৫ সালে জাসদ কী প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে তৎকালীন স্বৈরাচার, দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন প্রতিবাদের কী রকম আগুন ঝরত দৈনিক গণকণ্ঠের প্রতিটি কলামে! কীভাবে সরকারি ও সরকার দলীয় প্রাইভেট বাহিনীর হাতে তখন প্রাণ দিয়েছিল জাসদের প্রায় চার হাজার নেতাকর্মী, যাদের সকলেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সারির যোদ্ধা।

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল অন্তত ২০ জন জাসদ কর্মীকে। কীভাবে গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছিল মেজর জলিল, আ.স.ম. রব, মমতাজ বেগম ও অন্যদের। পরদিন (১৮ মার্চ) স্বয়ং আবদুর রাজ্জাক এসে কীভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ জাসদ অফিস। কীভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল গণকণ্ঠের কণ্ঠ। জাসদের প্রকাশ্য রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ায় ত্বরান্বিত হয়েছিল গোপন কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয়েছিল বিপ্লবী গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কমান্ড স্ট্রাকচার। বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী সরকারের অজ্ঞাতে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে একটি পাল্টা বাহিনী গড়ার কাজ কর্নেল তাহের নিশ্চয়ই 'বঙ্গবন্ধু' বা আওয়ামী লীগের স্বার্থে করেন নি।

এ-সব বাহিনী অবশ্যই 'বঙ্গবন্ধুর হাত ও সরকারকে মজবুত করার জন্য গঠন করা হয় নি, বরং এগুলো গঠন করা হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু'র সরকারকে উৎখাত করারই জন্য। 'বঙ্গবন্ধু' বা আওয়ামী লীগের প্রতি কর্নেল তাহের কোনো দুর্বলতাই পোষণ করতেন না। প্রাণের বিনিময়ে হলেও ওই আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার জন্য কর্নেল তাহের ছিলেন বদ্ধপরিকর।

অথচ, বর্তমান জাসদ নেতৃত্ব এমনভাবে কর্নেল তাহেরকে উপস্থাপন করেন যেন কর্নেল তাহের একজন একনিষ্ঠ মুজিবপ্রেমী ছিলেন এবং তিনি সবকিছুই করেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'র কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে। কর্নেল তাহেরের পরিবারের সদস্যরাও এখন মুজিবপ্রেমে বিভোর। এমনকি লুৎফা তাহেরও? কর্নেল তাহেরের ওপর আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের নেতা-মন্ত্রীরা ভাষণ দেন, যেন তাহের আওয়ামী লীগ ও বাকশালের কতই আপনজন ছিলেন। বর্তমান জাসদ যেন আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি 'বঙ্গবন্ধু'-ভক্ত।

জাসদ যদি এমন 'বঙ্গবন্ধু' ভক্তই হবে, তাহলে ১৯৭২-৭৫ সালে 'বঙ্গবন্ধু' সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কেন চার হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করানো হয়েছিল? কে নেবে দেশের এই চার হাজার শ্রেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুর দায়িত্ব? আওয়ামী লীগের কোলেই যদি উঠতে হয় তাহলে কী প্রয়োজন ছিল ১৯৭২ সালে জাসদ নামক সংগঠন নির্মাণের? কী জবাব অধ্যাপক নিখিল দাস, কর্পোর‍্যাল আলতাফ, এডভোকেট মোশাররফ, সিদ্দিক মাস্টার, হাদী, মন্টু,

www.pathagar.com

হেলাল, মফিজসহ অসংখ্য মানুষের কাছে যারা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল?

আশ্চর্য! ক্ষমতার লোভ মানুষকে কত নিচে নামিয়ে দেয়! আদর্শবাদী নেতাদের অধঃপতন ঘটলে নাকি তাঁরা সাধারণ নেতাদের চেয়েও অনেক নিচে নেমে যেতে পারেন। পারেন এমন কাজ করতে যা সাধারণ নেতারা করতেও বিবেকের দংশন অনুভব করেন।

কর্নেল তাহেরকে 'বঙ্গবন্ধু-ভক্ত' হিসেবে তুলে ধরা কি সত্যিই কর্নেল তাহেরের যথার্থ মূল্যায়ন? এটাই কি তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার নিদর্শন? সবচেয়ে বড়ো কথা— এটাই কি সত্যের প্রতিফলন?

হালুয়া-রুটির ফাঁদে পড়লে মিথ্যা কীভাবে সত্য হয়ে যায়, অলীক গল্প কীভাবে বাস্তব হয়ে যায়, রাত্রি কীভাবে দিন হয়ে যায়, তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনই বোধহয় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গন।

অবশ্য গায়ের জোরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসই যদি পাল্টে দেওয়া যায়, তাহলে কর্নেল তাহের বা ৭ নভেম্বরের ইতিহাস পাল্টানো এমন আর বেশি কী?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সংগঠক জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

রাজনীতিবিদ জিয়াউর রহমানের সংগঠন কৌশল

প্রেক্ষাপট

জিয়াউর রহমানের আগে রাজনীতির অর্থ ছিল নেতাদের অনেক বক্তব্য যার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি এবং বিরোধীদের উৎখাত করার কটাক্ষসম্পন্ন বক্তব্য (তার কিছুটা ছিল রাজনৈতিক বক্তব্য)। সংগঠনগুলো বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে গড়ে ওঠে নি।

সমাজকর্ম ছিল রাজনীতিতে উপেক্ষিত। রাজনীতিক নেতৃত্ব মূলত বেশিরভাগ আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যতিক্রমী কিছু ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন এবং রাজনীতি ছাড়া প্রায়ই এদের জীবনধারণের নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিল না।

চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, সমরবিদ, শিক্ষাবিদদের সংখ্যা ছিল সীমিত। এক কথায় পেশাজীবীরা হয় রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিলেন অথবা রাজনীতি তাদের আকৃষ্ট করতে পারত না।

সমাজকর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ কম ছিল বলেই সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদগণ তাদের নিজেদের পরিমণ্ডলে কাজ করতেন। তারা সীমাবদ্ধ ছিলেন নিজেদের গণ্ডিতে।

মহিলা ও শিশুদের দেশপ্রেম ও রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না।

কৃষকের সপক্ষে মৌখিক সমর্থন ছাড়া সংগঠিত করার চেষ্টা মাওলানা ভাসানী ও কিছু বামপন্থী দল ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দল তেমন কিছু করে নি

তবে শ্রমিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অনিবার্য ছিল তাদের অধিকার আদায় এবং সিবিএ সংগঠনের প্রয়োজনে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা ছিল দারুণ। এ তাগিদ ছিল তাদের দাবি-দাওয়ার প্রয়োজনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউনিয়ন গঠনের জন্য। তারুণ্যোদীপ্ত দেশপ্রেমের সেন্টিমেন্টে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল Activists (এ্যক্টিভিসটস) ছিল ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়।

মোট কথা: রাজনীতির সক্রিয়তা ছিল ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে। নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাজনীতি পুরোধা ছিলেন আইনজীবী এবং পেশাদার রাজনীতিবিদগণ (যাদের অনেকের জীবনধারণের অন্য পেশা ছিল না)। তারা পরিবারের উপার্জন নির্ভর ছিলেন প্রায়শ অথবা পার্টি তাদের ব্যবস্থা করতেন।

www.pathagar.com

এদেশের মানুষের স্বপ্ন

এই প্রেক্ষাপটে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর এলো স্বাধীনতা। সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষার পর এলো রক্তাক্ত বাংলাদেশের মানচিত্র এবং পতাকা। মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখেছিল।

স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হবে, উন্নয়ন হবে, বিপ্লবের গতিতে উৎপাদন হবে, গণশিক্ষার জোয়ার আসবে, দারিদ্র্য দূর হবে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা হবে, দেশ ও জনগণ হবে শোষণমুক্ত। দেশের মানুষের কথা বলার অধিকার, দল করার, সভা করার, ভোট দেবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বপ্ন ভঙ্গ ৭২–৭৫

কিন্তু এই সুন্দর স্বপ্ন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে গেল '৭২–৭৫-এর দুঃশাসন ও দুরাচারে। মানচিত্র এবং জাতীয় সংগীত এলো— কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলা এলো না। এলো অশান্তি, অনাচার, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রহীনতা, মৃত্যু এবং ক্রন্দসী বাংলাদেশ। সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলো। গণতন্ত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, অর্থনীতি ধ্বংস করা হলো।

বাংলাদেশ পরিণত হলো পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশে, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গণতন্ত্রহীন তলাবিহীন ঝুড়ির ভারসাম্যহীন একটি মানচিত্রে। যার সুষ্ঠু সংগ্রামী ঐতিহ্যের অতীত রইল কিন্তু যার বর্তমান ছিল ভয়াবহ এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিদ্র অন্ধকারময়।

জিয়া এলেন

এমনি পরিস্থিতিতে সিপাহী-জনতার বিপ্লব জোর করে জিয়াউর রহমানের হাতে তুলে দিল দেশশাসনের ভার। দেশ তখন জ্বলছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই, গণতন্ত্র নেই, অর্থনীতি নেই, সার্বভৌমত্ব নেই। এমনি পরিস্থিতি সামাল দেবার দায়িত্ব পড়ল জিয়াউর রহমানের হাতে।

জিয়াউর রহমান শক্ত হাতে শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করলেন। এদেশে সর্বস্তরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিয়ে দেশ পরিচালনার জন্য পরামর্শক সভা গঠন করলেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, সমর বিশেষজ্ঞ, ব্যারিস্টার— সব পেশার শীর্ষ ব্যক্তিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত হলেন।

পর্যায়ক্রমে রাজনীতিবিদও এলেন অনেক। বিভিন্ন পেশাজীবীদের শীর্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয় সাধনই দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হতে পারে, একথা জিয়াউর রহমান বুঝেছিলেন। তাই এটাকে পরবর্তী পর্যায়ে দল সংগঠনের কৌশল হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। রাজনীতিবিদদের মর্যাদা দিয়েছেন সবার ওপর— কেননা তিনি নিজেই সেরা রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন

www.pathagar.com

সময়ের বিবর্তনে এবং শীর্ষ পেশাজীবী-রাজনীতিক সমন্বয়ে তিনি উন্নয়নে বিপুল সাফল্য লাভ করলেন অল্পদিনেই। তবে তার ব্যক্তিচরিত্র— দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার গুণ, উদারতা এবং আন্তরিকতা ছিল তার নেতৃত্বের সাফল্যের মূল কারণ।

এগুলো নেতৃত্ব পর্যায়ে বহু দিন দেখে নি জনগণ। তাই জিয়ার নেতৃত্বে এল তাদের বিপুল আস্থা। এ ছাড়া তার পাশে দাঁড়ানো পেশাজীবী শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের চরিত্রও ছিল প্রশংসনীয়।

বিএনপি গঠন

কতকগুলো বাস্তবতা সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান সচেতন ছিলেন।

১। রাজনীতির অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে এবং থাকবে।

২। বাকশাল সৃষ্টি এবং তার ভয়াবহ পতন প্রমাণ করেছে, এদেশে বাকশাল চলবে না। এদেশে বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা রয়েছে।

৩। রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করতে পারে একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারা— যার মধ্যে—

(ক) স্বাধীনতা সার্বভৌত্বের আশ্বাস থাকবে দৃঢ়ভাবে,

(খ) বহুদলীয় গণতন্ত্র হবে নিশ্চিত এবং

(গ) উৎপাদন-বণ্টন-সমাজকর্ম হবে রাজনীতির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত।

এই রাজনীতির শূন্যতা তখন ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, উৎপাদন ও সমাজকর্ম সমন্বিত রাজনীতি দিতে পারে, এমন রাজনীতির জন্য দেশ ও জাতি তাকিয়ে ছিল অনেক আশাভরসা নিয়ে। কেননা, এগুলোই ছিল মুক্তিযুদ্ধের আসল চেতনা। এই প্রতিটি মূল্যবোধকে আওয়ামী বাকশালী সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গেছে ৭২–৭৫ শাসন আমলে।

জাতীয় প্রয়োজনে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সুন্দর জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিসহ স্বাধীনতা সর্বাভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকারসম্পন্ন একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। জিয়াউর রহমান সেই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনকে বাস্তবায়িত করতে বাধ্য হলেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বিএনপির জন্ম

ইতিহাসের প্রয়োজনে বিএনপি-র জন্ম হলো। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-তে রমনার সবুজ চত্বরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দলের জন্ম। আমন্ত্রণলিপি ছাপা হলো অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নামে। সরকারি নির্দেশনামা ছিল নতুন রাজনৈতিক দল করতে হলে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। জাতীয়তাবাদী দলের লাইসেন্সে দরখাস্ত সই করেছিলেন অধ্যাপক বদরুদ্দোজা

www.pathagar.com

চৌধুরী। দলের দরখাস্তের ঠিকানা ছিল 'শ্যামলী', ২২৭, মগবাজার, আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা। পরবর্তীতে এই ঠিকানা থেকেই ছাপা হয় দলের প্রথম গঠনতন্ত্র। জিয়াউর রহমান তখন দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি সুন্দর করে সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীবৃন্দসহ উপস্থিত এই সমাবেশে দল গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন দীর্ঘ। শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব হলো।

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন— আমন্ত্রণ লিপিতে উল্লিখিত কে এই বদরুদ্দোজা চৌধুরী?

জিয়াউর রহমান মুচকি হাসলেন।

বি. চৌধুরী? বাংলাদেশে তো একজনই আছেন। আপনারা চেনেন না? ...

উত্তরে সবাই সশব্দে হেসে উঠলেন।

কিন্তু নাম ঘোষণা করলেই একটা দল দাঁড়িয়ে যায় না। এটা জিয়াউর রহমান জানতেন এবং বুঝতেন।

রাজনৈতিক দলেরও কিছু ন্যূনতম মাপকাঠি থাকতে হয়।

১। এর জন্মের জাতীয় প্রয়োজন থাকতে হবে (শুধু নেতৃত্ব বদলের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করলে আসলে তা হবে অর্থহীন, সেটা হবে স্বার্থপরতার প্রমাণ)।

২। দলের আদর্শ ও লক্ষ্যস্থল থাকতে হবে।

৩। দলের রাজনৈতিক দর্শন থাকতে হবে।

৪। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দলের মৌলিক কর্মসূচি থাকতে হবে।

৫। দলের কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ে দলীয় সংগঠন এবং অঙ্গ দলসমূহের সংগঠন থাকতে হবে।

৬। গণতান্ত্রিক দল হলে তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময়, দলীয় মৌলিক কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি (ম্যানিফেস্টো) দিতে হবে। সমকালীন সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো তৈরি হবে। তবে দলীয় মৌলিক কর্মসূচির ভিত্তিতে তা সমর্থিত হতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জন্য জিয়াউর রহমান এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখেছেন।

ক। এ দলের আদর্শ ও লক্ষ্যস্থল এদেশের মানুষকে একটা শোষণমুক্ত সমাজে পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার।

খ। এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতিজ্ঞাকে চিরস্থায়ী রাখতে পারে এমন একটি দর্শন এ দলের আছে— বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন। এই দর্শনের মাধ্যমে এদেশের সমতল ও পাহাড়ের সব মানুষের মধ্যে, মুসলিম-হিন্দু, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের মধ্যে, সমাজের বিভিন্ন

www.pathagar.com

পেশাজীবী ও স্তরের মানুষের মধ্যে ইস্পাতকঠিন গণঐক্য গড়ে তুলতে পারবে।

আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধ, ভাষাযুদ্ধ, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে আমরা সহস্র বছরের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জন করেছি এই জাতিত্ববোধ। বাংলাদেশের মানচিত্র ও পতাকা চিরঞ্জিব রাখতে পারবে ধর্মীয় ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদে সেই নিশ্চয়তা নেই।

গ। দলের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মৌলিক কর্মসূচি ১৯ দফা এদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার গ্যারান্টি। (এ ছাড়া প্রতিটি নির্বাচনে নির্বাচনী কর্মসূচির ব্যবস্থাও স্বীকৃত রয়েছে)।

ঘ। দলের কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যায়ে নির্বাচিত সংগঠনের নিশ্চয়তার ভার নিলেন জিয়াউর রহমান এবং উপস্থিত করলেন সমাজে পরিচিত একটি সৎ নেতৃত্ব। এখানে পেশাজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদগণ সম্মিলিত নেতৃত্ব দেবার অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন।

ঙ। নির্বাচনী কর্মসূচির ভিত্তি করলেন ১৯ দফা কর্মসূচির সঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিমান সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা।

জিয়াউর রহমানের বৈশিষ্ট্য

জিয়াউর রহমানের সাংগঠনিক কৌশলের অনেকগুলো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

নেতৃত্ব সৃষ্টির কৌশল

'নেতৃত্বে' তিনি স্বয়ং যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন এটা অবশ্যই অনুকরণীয় ছিল। তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের মূল কারণ ছিল তাঁর প্রতিটি কাজের মূল প্রেরণা ছিল তাঁর দেশপ্রেম। তাঁর দেশপ্রেম ছিল নিখাদ। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় সব সময়ে তিনি ১০০-তে ১০০ নম্বর পেয়েছেন। এ জন্যেই স্বাধীনতাযুদ্ধে যখন আওয়ামী রাজনৈতিক নেতাগণ সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলো, যথাসময়ে জিয়া জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে আহ্বান করলেন। দেশপ্রেমের কারণেই ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের পর দেশ রক্ষার জন্য তিনি বিপন্ন দেশকে নেতৃত্ব দিতে রাজি হলেন। তাঁর দেশপ্রেমই তাঁকে জাতীয়তাবাদী বহুদলীয় গণতন্ত্র, উৎপাদন ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবমুখী, সার্বভৌমত্বের সপক্ষে রাজনীতি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট হবে— দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিকতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে দৃঢ় অঙ্গীকার। বাস্তবে তার ১০০ ভাগ প্রতিফলন থাকতে হবে। এর সঙ্গে থাকতে হবে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দেবার ও কর্মী নির্বাচনে সঠিক বাছাই করার যোগ্যতা। এটা শক্ত কাজ, জিয়া তা জানতেন।

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ছিল। মানুষ ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। জিয়া-পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, তার সব নেতা-কর্মী নির্বাচন সঠিক ছিল না। অনেকেই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের সঙ্গে ক্ষমতার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করেছে। কেউ কেউ ভুল বুঝে ফিরে এসেছে। অনেকে আবার ক্ষমতা হারিয়ে তাঁর দলে ফিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু মৌলিকভাবে জিয়াউর রহমান নিজের চরিত্রের মাধ্যমে দল ও জাতির জন্য সত্যিকার সফল নেতৃত্বের উদাহরণ রেখে গেছেন।

শীর্ষ নেতৃত্বের কৌশল

তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তিনি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শীর্ষ ব্যক্তিদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যারিস্টার-এ্যাডভোকেট, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সমরবিদ, মহিলা ও শ্রমিক নেতা-নেত্রীদের মধ্যে যারা সফল তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব তারকাখচিত ছিল না। মন্ত্রিসভা ও রাজনৈতিক দলে এই প্রতিভাখচিত নেতৃত্ব সহজেই জনমনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।

জিয়াউর রহমান যত দিন রাজনীতিতে ছিলেন, সব সময় তিনি এই ধরনের প্রতিভাবানদের খুঁজতেন। সাহায্য করতেন এবং তাদের সহায়তা নিতেন। গ্রামে, ইউনিয়নে সফল চেয়ারম্যান থেকে সফল মহিলা সমাজকর্মী সবাইকে তিনি প্রশংসা করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। এইভাবে সারাদেশে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যায়ে তিনি নেতৃত্ব সৃষ্টি করে গেছেন।

'নেতৃত্ব' মানে শুধু মস্তবড়ো রাজনৈতিক নেতা তৈরি করা নয়— বরং সমাজের প্রতিক্ষেত্রে আদর্শ ও অনুকরণীয় কার্যক্রম সৃষ্টি করতে পারে এমন সব মানুষকে বড়ো করে তুলে ধরা, এটা জিয়াউর রহমান বুঝেছিলেন। এদেশের রাজনীতিতে সেই হিসেবে চরিত্রবান, কর্মিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক সত্যিকারের গণতন্ত্রী, উদারমনা নেতৃত্বের অভাব ছিল, তারই সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গনেও অভাব ছিল সেই চরিত্রবান নেতৃত্বের। অভাব ছিল শিক্ষাঙ্গনে, চিকিৎসা জগতে, ব্যবসা ও শিল্পাঙ্গনে, প্রশাসনে, গ্রামীণ কর্মসূচি ইত্যাদিতে। তাই সর্বত্রই নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রচুর সুযোগ ছিল।

রাজনৈতিক সংগঠনে এই নেতৃত্বে সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। জিয়াউর রহমানের এই কৌশল তাই তখনো প্রয়োজন ছিল, এখনো সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। ভালো লোক খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের সুযোগ দিতেই হবে। এটা হবে রাজনীতিতে একটি চলমান প্রক্রিয়া।

www.pathagar.com

দল ও অঙ্গদল সংগঠন

বড়ো দল করতে হলে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। যে দেশে বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে থাকে— রাজনীতির শেকড় সে দেশে অবশ্যই গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। সেজন্যে জিয়ার দল গ্রাম কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, থানা কমিটি, জেলা কমিটি হয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আসবে— এটাই ছিল তার নীতি।

এ-ছাড়াও সব মানুষের মধ্যে তরুণ ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবশক্তি, সংস্কৃতি কর্মী, সেচ্ছাসেবী মহিলা সবাইকে অঙ্গদলে সম্পৃক্ত করেছেন-তিনি।

জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কৌশল

জিয়া জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করেছেন। তার আগে কোনো নেতা-নেত্রীকে দেশের মানুষ এতো কাছে থেকে দেখার, কথা বলার ও কাজ করার (খালখনন, গণশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে) সুযোগ পায় নি। জিয়ার এই স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রায় ৫০০০ জনসভা, কর্মীসভা, সমাজ সংগঠনমূলক সভা করেছেন— এটা বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর অন্যদেশের তুলনায়ও রেকর্ড।

বক্তব্যের কৌশল

তিনি জনসভায় দীর্ঘ বক্তব্য দিতেন, প্রশ্নোত্তর করতেন, মতামত নিতেন এবং হাজার মানুষের সঙ্গে হাত মিলাতেন। দলের কথার চেয়ে বেশি কাজ করার কথা বলতেন। ভাগ্য উন্নয়নের কৌশল আলোচনা করতেন। কৃষক, শ্রমিক ও মা-বোনদের ভাগ্য, গ্রামের উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথা বলতেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলতেন। এগুলোই ছিল গণসংযোগে তাঁর রাজনৈতিক ভাষা। বিরোধী দলকে গালিগালাজ, অন্য নেতৃত্বকে অসম্মান করার চেষ্টা তাঁর ভাষায় ছিল না।

তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতেন তার বক্তব্যে। জাতিকে বিভক্ত করতেন না। সহনশীলতা তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠত, হিংসা ও ধ্বংস তার বক্তব্যে আসত না। সমস্ত জাতি তার ইতিবাচক বক্তব্যে ঐক্যবদ্ধ হতো, নেতিবাচক বক্তব্যে বিভক্ত হতো না।

তার দল থেকে তখন প্রচুর লিফলেট, ছোট বই এবং অসংখ্য পোস্টার ছাপা হতো। বন্যা থেকে রক্ষা পাবার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার, এমনকি গম বীজ কেমন করে রাখতে হবে তার পোস্টার, লিফলেটও বিএনপি থেকে ছাপা হয়েছিল।

সাংবাদপত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সমালোচনার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া জিয়াউর রহমানের রাজনীতির অংশ ছিল।

সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক প্রতিনিধিসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায়ই বৈঠক করতেন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল (আওয়ামী নেতাগণসহ) থেকে প্রতিনিধিদের তিনি প্রায়ই আহ্বান করতেন আলোচনায়। অবশ্য আওয়ামী নেতৃবৃন্দ প্রায়ই অসহযোগিতা করতেন তাঁর সঙ্গে।

সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পৃক্তকরণের কৌশল

সামাজিক কমসূচির সঙ্গে রাজনীতির সম্পৃক্তকরণ এর আগে অন্য দল, অন্য নেতারা দেখাতে পারেন নি। জিয়াউর রহমানের বক্তব্যে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাই সামজিক কর্মসূচি বড় জায়গা দখল করেছে।

গণশিক্ষার বিপ্লব ডেকে দিলেন তিনি— লক্ষ্য ছিল ৫ বছরে দেশের শতকরা ৮০% কে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করবেন। তিনি নিজে হারিকেন জ্বালিয়ে গ্রাম বাংলায় কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীকে অনুপ্রাণিত করলেন এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে।

কৃষি ও খালখনন কর্মসূচিতে দেড় বছরে ১৪০০ খাল কাটলেন জিয়াউর রহমান। কোটি জনতার সঙ্গে বিএনপির যুব-কিশোর-প্রবীণ এবং মা-বোনেরা অংশ নিল কোদাল-টুকরি হাতে।

রাজনীতি পুরোপরি উন্নয়নের ভাষায় জেগে উঠল। রাজনীতির এই রূপ বাংলাদেশ আগে দেখে নি।

বোনদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই, হাতের কাজ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ল, বিএনপির দল-অঙ্গ দলের কর্মীদের মাধ্যমে।

যুবদের বিশেষ কর্মসূচির ভার নিল মূলত বিএনপির যুবকর্মীরা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির কথাও বলতে হলো বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন সমাবেশে।

রাজনীতি যেখানে ছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই ও হাতিয়ার— জিয়াউর রহমান তাকে সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করলেন। এ-সব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে বিএনপি হলো মজবুত— তার শিকড় প্রোথিত হলো মানুষের অন্তরে।

সংস্কৃতি কর্মসূচির কৌশল

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অহংকার ধ্বংস করে দিতে জল, স্থল অন্তরীক্ষে যুগে যুগে চলছে, চলবে বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন। ছাপা মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে রয়েছে এই আগ্রাসনের প্রবল অভিযান।

এর ভালো দিকের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্র এবং প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করার মতো বিষয় বস্তুত বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন রয়েছে।

এই সবের বিরুদ্ধে নিজের সংস্কৃতির অহংকারকে জাগিয়ে রাখতে গিয়েই জিয়াউর রহমান রাজনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

দলীয় সংগীত হিসেবে প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরুক রাখার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার করলেন।

তাঁর জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ গানের সঙ্গে তিনি নিজেকে সমার্থক করে গেছেন। জাতীয়তাবাদী এবং গীতিময় দেশপ্রেমে এই গান ছন্দোবদ্ধ গীতিকারকে এ গানের জন্য দল থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, টিভি রঙিনকরণ, টিভিতে শিশু অনুষ্ঠান ও নাচ, গান, নাটকের বিভিন্ন সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান— ইত্যাদিতে সরকারি ও দলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অহংকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃতি-কর্মীদের সম্মান দিয়েছেন, গর্বিত করেছেন।

জিয়াউর রহমানের সাংগঠনিক কৌশল অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এগুলো থেকে আমাদের শিখতে হবে।

বড় সংগঠন গড়তে গেলে কখনো সংগঠন কাঠামোতে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে বিরোধ হয়, একই পদের জন্য একাধিক প্রার্থী হয়। এগুলো দ্রুত সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান না করলে, প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

জিয়াউর রহমানের সময় কোথাও এ রকম হলে সঙ্গে-সঙ্গে তা নিরসন করা হতো। সাধারণত জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে ২/৩ জন সদস্য দিয়ে কমিটি গঠন করা হতো। এই কমিটি ১-২ সপ্তাহের মধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

স্থায়ী কমিটির কৌশল

জাতীয় স্থায়ী কমিটি ছিল সর্বোচ্চ কমিটি। এই কমিটির একটা অলিখিত নিয়ম ছিল। দলের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও প্রভাব সরকার বা মন্ত্রিসভার চেয়ে বেশি। এটা ছিল নীতি। তাই মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য মন্ত্রী হলে তৎক্ষণাৎ তাকে স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ ছাড়তে হবে। স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ দলীয় সভায় মন্ত্রীদের উপরে সম্মান পেতেন।

মিসেস তসলীমা রহমান স্থায়ী কমিটির সদস্য পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ড. আমিনা রহমান শুধুমাত্র মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পরই স্থায়ী কমিটির সদস্য হন। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী মহাসচিব হবার পর উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

এগুলো ছিল রাজনীতিবিদ জিয়াউর রহমানের সংগঠন কৌশল। এই প্রতিটি কৌশলই বিএনপির শক্তি, জনসংযোগ, স্থায়িত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির মূল ভিত্তি।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ গণেশ হালদার

৭ নভেম্বর স্মৃতিতে অম্লান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী তফসিলি সেলের আহ্বায়ক কার্তিক ঠাকুরের লেখা 'শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তফসিলি সম্প্রদায়' নিবন্ধে সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনাতে মাদারীপুর জেলার শশিকির গ্রামে বিনিদ্র রজনী জাগরণ ও গোপালগঞ্জ জেলার সাতপাড়া হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান শুরু— কথাগুলো আলোচিত হয়েছে। লেখাটি পড়ে অনেক কথাই মনে পড়ে গেল।

জিয়া একটি নাম, একটি আদর্শ, একটি প্রেরণা। উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এই নামটি সকলের কাছে উদ্‌ভাসিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যদিয়ে। স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে। সবাই যখন হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, যোগ্য দেশনায়ক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে অকুতোভয়ে ঘোষণা দিলেন স্বাধীনতার। প্রেরণা যোগালেন দেশবাসীর মনে।

পঁচিশে মার্চের কাল কুটকুট অমানিশার অবসানের বার্তা পৌঁছে দিলেন সকলের ঘরে। ডাক দিলেন মুক্তিযুদ্ধের। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুতি নিল সকলে। ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদারদের ওপর মুহূর্তের মধ্যে। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি সকল অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করল। শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখল সকলে।

দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ চলল। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলো, স্বাধীনতার লাল সূর্য উদিত হলো পূর্ব আকাশে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সকলে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো এক সঙ্গে গেয়ে উঠল— "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ...।"

"তিন বছরের মধ্যে কিছু দিতে পারব না"— তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার মধ্যদিয়ে জাতিকে সান্ত্বনা দেয়া হলো। আশ্বস্ত করা হলো: জনগণ তাতে আশান্বিত হলো বটে কিন্তু মহিমান্বিত হলো না।

যারা দেশের জন্য জীবন দিল, মুক্তিযুদ্ধ করল, যাদের মা-বোনেরা ইজ্জত হারাল, যারা দেশ ছেড়ে শরণার্থী হলো— স্বাধীনতার পর তাদের তৎকালীন মন্ত্রী মরহুম মোল্লা জালালউদ্দিনের মুখ থেকে শুনতে হলো— "বেল পাকলে কাকের কি?" তারা চোখের সামনে দেখতে পেল— মুক্তিযোদ্ধার কারো কারো আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। নব্য মুৎসুদ্দি আমলাগোষ্ঠী সৃষ্টি করে শাসকদল

www.pathagar.com

শোষণের যাঁতাকলে জনগণকে নিষ্পেষিত করছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সামাজিক ন্যায়-বিচারের পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে। আস্তে আস্তে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। শাসকগোষ্ঠী "চোরের খনি হতে সোনার খনি" পাবার প্রত্যাশায় বাকশাল সৃষ্টি করে সকলের কণ্ঠ রোধ করছে।

দেশের এই দুঃসময়ে পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আবার আবির্ভাব ঘটল এক মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে।

দেশের হাল ধরলেন তিনি শক্ত হাতে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিলেন জনগণের বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে এবং ঐক্যবদ্ধ এক শক্তিশালী জাতি গঠন করতে তিনি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করে তার মন্ত্রিপরিষদে স্থান দিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা রসরাজ মণ্ডলকে।

তিনি উপলব্ধি করলেন সকল শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশের উন্নয়ন সম্ভব। পাহাড়ি, বাঙালি, গারো, হাজং, সাঁওতাল, বাগধী প্রভৃতি জাতিসত্ত্বার মানুষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান উদ্দেশে জাতির সামনে তাই উপস্থাপন করলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন।

ধর্মগত জাতীয়তাবাদ এবং ভাষাগত জাতীয়তাবাদ আমাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না— তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় করতে তিনি গঠন করলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা মেটাতে তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি হাতে নিয়ে ছুটে চললেন দেশের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে।

খালকাটা, পরিবার পরিকল্পনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের মতো দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি একটি মৃতপ্রায় জাতির বুকে প্রজ্বলিত করলেন আশার আলো। সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা সৃষ্টি করলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তলাহীন মৃতপ্রায় জাতি জেগে উঠল তাঁর প্রাণচাঞ্চল্যে "আমার প্রথম বাংলাদেশ, শেষ বাংলাদেশ ..." সুরের মাধুর্যে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় করতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপলব্ধি করলেন দেশের এক-দশমাংশ জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে আছে। তাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত মজবুত করতে এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে জড়ো করতে হলে তাদের কাছে যেতে হবে। এই উপলব্ধি থেকে তিনি দীর্ঘ দিনের অবহেলিত ও বঞ্চিত তফসিলি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র সংগ্রহের নির্দেশ

www.pathagar.com

দিলেন তৎকালীন জেলা প্রশাসকদের। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিশেষ বিশেষ এলাকায় সফর করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি ছুটে আসলেন মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার নবগ্রাম ইউনিয়নের শশিকর গ্রামে। বিনিদ্র রজনী কাটালেন সেখানে।

শশিকর একটি হিন্দু অধ্যুষিত বর্ধিষ্ণু এলাকা। এখানে অঞ্চলের পুরাতন হাইস্কুল 'শশিকর হাইস্কুল' অবস্থিত। এই স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহীদ স্মৃতি কলেজ।

১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর কলেজের স্বার্থে এবং এলাকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে আমি সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম আমার রাজনৈতিক গুরু তৎকালীন ন্যাপের (ভা) জেনারেল সেক্রেটারি মরহুম মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়ার কাছে। তাঁর মাধ্যমে ১৯৭৬ সালের জুন মাসে আমার প্রথম পরিচয় প্রশাসক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে। এলাকার সমস্যা, সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের জন্য আমি প্রাক্তন সংসদ সদস্য প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ তালুকদার, সাবেক মন্ত্রী গৌরচন্দ্র বালা, তুষার বারুরী তাঁর ক্যান্টনমেন্টস্থ কার্যালয়ে প্রথম সাক্ষাৎ করি।

তখন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব। সাক্ষাতের সূচনালগ্নে তিনি আমাদের চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। মিনিট দশেক পর জিয়াউর রহমান সাহেব আসলেন। হাত মিলালেন আমাদের সাথে। বন্ধুভাবে কুশল বিনিময় করলেন এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনলেন সব কথা। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ধীশক্তি এবং বিচক্ষণতা আমাদের মুগ্ধ করল।

আমরা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে আসলাম। কিছু দিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কথা। বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ছিল তাঁর দর্পন; এর মধ্যে নিহিত ছিল দেশ ও জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি, জাতীয় ঐক্যের বীজ।

১৯৭৮ সালে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শেষ হয়েছে। নবগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এখানকার ঐক্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— জিয়াউর রহমান সাহেব উপলব্ধি করলেন।

তাই তিনি ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর সফর করলেন নবগ্রাম ইউনিয়ন। স্থান নির্ধারণ করলেন শশিকর। রাত কাটালেন সেখানে। শশিকরের যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ভালো ছিল না ; বিদ্যুৎ ছিল না, পাকা কোনো বাড়ি ছিল না। স্কুল, কলেজ ছিল বটে, তাও ছিল কাঁচা ভিত, টিনের ঘর। তার সফরের দিনটি ছিল এলাকার জন্য তাৎপর্যময়। আবালবৃদ্ধবণিতার জন্য উৎসবের।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতির আগমনের বার্তা নিয়ে যেদিন প্রথম সরকারিভাবে তৎকালীন জেলা প্রশাসক শাহ্ মুহম্মদ আবু বাকের এবং পুলিশ সুপার মো. কবির শশিকর আসেন সেদিন এলাকাবাসী যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল, তা পালনে তারা সফল হয়েছিল। অর্থনৈতিক দৈন্য, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক বিরোধিতা তাদের হারাতে পারে নি। বিলের মধ্যে হেলিকপ্টার নামিয়ে কাদা মাঠে ধানের নারা দিয়ে বেঁধে জনসভা করে তারা প্রমাণ করেছিল— ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শশিকর পৌঁছেছিলেন বেলা ২-২০ মিনিটের সময়। মাঠ-ঘাট তখন লোকে লোকারণ্য; তিল ঠাঁই জায়গা ছিল না কোথাও। গাছপালা ঘরের চাল বোঝাই ছিল লোকে। ওই দিন এক অভিনব সাজে সজ্জিত ছিল এলাকা। প্রিয়জনের অপেক্ষায় ছিল সবাই। আল্পনা এঁকে তার আগমনপথ সুসজ্জিত করা হয়েছিল ; বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গৃহবধূরা।

হেলিকপ্টার হতে নেমে অভিবাদন গ্রহণ করে তিনি সোজা চলে গেলেন জনসভা স্থলে। সভামঞ্চে উঠে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন সকলকে। সভা শেষে হঠাৎ করে নিরাপত্তা বেষ্টনি ভেদ করে তিনি চলে গেলেন জনগণের মধ্যে। হাত মিলালেন তাদের সাথে। অটোগ্রাফ দিলেন অনেককে।

সন্ধ্যার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া কলেজের সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় বসে প্রিয় যেমন প্রিয়জনের কাছে থেকে উপভোগ করে সে রকমভাবে উপভোগ করলেন আতশবাজির খেলা এবং গ্রামীণ গানের সুরের লহরি। রাত ৮টায় নৈশভোজের পূর্বে তিনি ঘরোয়াভাবে বৈঠক করলেন তফসিলি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে।

ধৈর্যের সাথে শুনলেন তাদের কথা। সেখানে আমাকে স্কুল, কলেজের কথাগুলো প্রাথমিকভাবে, তারপর এলাকার রাস্তাঘাট এবং সবশেষে সম্প্রদায়ের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে-বসা শত্রু সম্পত্তি আইনের নিষ্পেষণের কথা, চাকরি-বাকরিতে প্রতিনিধিত্বহীনতার কথা তুলে ধরতে হয়েছিল। তিনি কথা দিয়েছিলেন— "আপনাদের সব শুনব, আপনারা আমার সাথে হাত মিলান, বুকে বুক মিলান, সব পাবেন।"

তাঁর কথাগুলোর মধ্যে এতই আন্তরিকতা ছিল— যা সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সবাই একত্রে দাঁড়িয়ে কথা দিল— "হ্যাঁ, আমরা আপনার সাথে আছি।" উপস্থিত সবাই করতালি দিয়ে স্বাগত জানাল।

কিন্তু বিধাতার এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস— শশিকরে তাঁর সফরের কয়েক দিন পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে আততায়ীর হাতে তিনি শহীদ হন। তাঁর মহাপ্রয়াণে দেশ হারাল যোগ্য দেশনায়ককে। জাতি হারাল যোগ্য সন্তানকে, আমরা হারালাম আমাদের বন্ধুকে, অভিভাবককে। সংখ্যালঘু তফসিলিদের তিনি ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু।

www.pathagar.com

তাঁরই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর যোগ্য সহধর্মীনী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পরবর্তীকালে যে যোগসূত্র সংখ্যালঘুদের সাথে স্থাপন করেছেন, শশিকরে গিয়েছেন, তফসিলিদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন— তা আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে— প্রত্যাশা সকলের। ছিন্ন তারে আবার জোড়া লাগবে— আশাবাদী সকলে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - ১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর : সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়সমূহ

দৈনিক ইত্তেফাক
(শনিবার, ২১ কার্তিক, ১৩৮২)

নব উত্থান

'রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু মানব প্রকৃতি মানুষের মতই স্টেবল বা স্থিতিশীল।' কথাটা বলিয়াছেন সমাজতত্ত্ববিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক গাইভার। এই কথার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে গতকাল শুক্রবার, দেশের বীর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া।

গতকাল শুক্রবার (৭ নভেম্বর, ১৯৭৫) প্রত্যূষে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল'ল এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। দায়িত্বভার গ্রহণটির পর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বলিয়াছেন—

'বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যদের অনুরোধে আমাকে চীফ মার্শাল'ল এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' সর্বস্তরের জনগণের প্রতি একই ভাষণে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্ব-স্ব স্থানে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল ৭ নভেম্বর যে প্রভাতের সূচনা হইয়াছে তাহা ছিল দেশের বীর সিপাহী ও সাধারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণঢালা আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখর। গত ৩ নভেম্বরের অ্যাডভেঞ্চারিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পতনের সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজধানীর জনতা আনন্দ-কলরবে ছুটিয়া আসিয়াছে রাজপথে। দেখা গিয়াছে লরি ও ট্রাকের অন্তহীন মিছিল। শোনা গিয়াছে, মোস্তাক ও জিয়ার নামে ধ্বনি ও কণ্ঠবিদারী শ্লোগান।

লরি ও ট্রাকের মিছিল বা জমায়েতের সর্বত্র পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অবস্থান করিয়াছেন বীর সিপাহী ও সাধারণ জনগণ। একই সাথে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সেনাবাহিনীসহ দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগণ কতখানি যে সজাগ, সচেতন, তাহা

www.pathagar.com

হর্ষোৎফুল্ল সৈনিক-জনতার কণ্ঠ ধ্বনিতে বারবার সমুদ্র কল্লোলের মত মন্দ্রিত স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে। গতকালের ঘটনায় কার্যত ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা ও শিক্ষাই উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনগণের আস্থা ও সমর্থনই যে দেশের শাসন ক্ষমতার একমাত্র সোপান, এই সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে বহুবারের মত আর একবার।

প্রমাণিত হইয়াছে এই সত্যই যে, জনতার অধিকার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবনের পথে যে কোন চক্রান্তই অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা করুক, তাহা শেষ পর্যন্ত নস্যাৎ হইয়া যাইবেই।

গত ১৫ আগস্ট তারিখে নব পরিবর্তনের ধারায় মোস্তাক আহমদের সরকার জনগণের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন, গতকালকের সৈনিক-জনতার বিশাল ব্যাপক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উহার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও আস্থা ঘোষিত হইয়াছে। গতকালকের বীর সৈনিক ও জনতার অভ্যুত্থানকে বিবেচনা করিতে হইবে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামী ইতিহাসের আলোকে এবং নিতে হইবে সেই ইতিহাস হইতে শিক্ষা। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাদ দিয়া, তাহাদের অধিকারের কথা চিন্তা না করিয়া, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি কোনটাই হইতে পারে না। মানুষ লইয়াই দেশ এবং মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ চেষ্টার মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠে দেশের সার্বভৌম আত্মা।

এই হিসাব ও বিবেচনার এতটুকু ব্যত্যয়, এতটুকু বিচ্যুতি ঘটিলেই অনিবার্যভাবে দেখা যাইত জনতার রোষবহ্নি ও প্রতিরোধ শক্তি। সময় আপন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, সাথে সাথে বহিয়া চলিয়াছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারাও। যে কোন দেশের উত্থান ও পতনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যেরই প্রতিফলন দেখা যায়। গতকালকের সৈনিক-জনতার বিশাল, ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রেরও পতন হইয়াছে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা। এই ঘোষণা এখন যথোচিত ব্যবস্থা ও কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হইবে। জাগ্রত করিতে হইবে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর দায়িত্ববোধ।

গতকালকের উত্থানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সৈনিক-জনতা জনাব মোস্তাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি যে প্রত্যাশা, আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করিয়াছেন উহা ইতিহাসের এক নজিরবিহীন অধ্যায়। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সৈনিক-জনতার এই রায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিবে— ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

দৈনিক ইত্তেফাক

(রবিবার, ২২ কার্তিক, ১৩৮২)

নবযাত্রা শুরু

গত শুক্রবার সেনাবাহিনী ও জনগণের সম্মিলিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসনব্যবস্থায় ও জাতীয় পরিস্থিতিতে যে পট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এক কথায় ঐতিহাসিক। সিপাহী-জনতা নির্বিশেষে দেশবাসী কি চায়, গত শুক্রবারের সম্মিলিত অভ্যুত্থানে তাহা আর একবার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমদের ভাষায়, এই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীয় সত্তার নব অর্জিত মহিমা সমুদ্ভাসিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, স্বতঃস্ফূর্ত গণদাবি সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও খন্দকার মোস্তাক আহমদ পুনরায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যিনি সম্পূর্ণ নির্দলীয় এবং অরাজনৈতিক। এই কারণেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনরত প্রেসিডেন্ট সায়েমকেই তাহার জাতীয় দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এদিকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ছাড়িয়া দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে অপর দুইজন বাহিনীপ্রধানের সহিত অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

বস্তুত, সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়া দেশবাসীর স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আদর্শিক নিষ্ঠা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে আরেকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, অ্যাডভাঞ্চারিজমের হঠকারিতা নয় বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশবাসী দেশ শাসনের অধিকার চায়। তাহারা চায়, কাহারও লেজুড়বৃত্তি না করিয়া স্বকীয় আদর্শের উজ্জ্বল আলোকে জগৎসভায় নিজস্ব ভূমিকা পালন করিতে।

কথায় বলে, সঙ্কটের সময়ে ব্যক্তির মত জাতিরও সঠিক পরিচয় ধরা পড়ে। আমাদের মতে, সিপাহী-জনতার সাম্প্রতিক বিপ্লব অভ্যুত্থানে বাঙালি জাতির যে পরিচয় সমুদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা জাতীয় সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিপাহী-জনতার এই অভ্যুত্থান প্রমাণ করিয়াছে যে কোন হুমকির মুখে জাগ্রত জনতা তাহাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম।

আমাদের স্থির বিশ্বাস, বর্তমানের এই আদর্শনিষ্ঠ আবেগ, মোহমুক্ত মানসিকতা এবং প্রাণচাঞ্চল্যের কর্মধারা যদি আমরা সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে অব্যাহত রাখিতে পারি, তবে জাতীয় ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা হইয়া দেখা দিতে পারিবে না, কোন সঙ্কটই চলার পথের এই উদ্দাম গতিকে রোধ করিতে পারিবে না। এ জন্যই প্রয়োজন আজ ঐক্য ও সংহতির

www.pathagar.com

এবং সর্বোপরি প্রয়োজন আজ জাতীয় জীবনের ঈমানসমৃদ্ধ অটুট মনোবলের। অতীতে খন্দকার মোস্তাক আহমদের সরকারকে ঘরে ও বাহিরে অনেক অসুবিধা ও সঙ্কটের মধ্যদিয়া পথ চলিতে হইয়াছে।

বর্তমানেও সেসব সঙ্কট ও অসুবিধা, বাধা এবং বিপত্তি যে একেবারে অপসারিত হইয়াছে তাহা নয়। তবে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট সায়েমের এই নির্দলীয় অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সঙ্কট ও বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়নের পথে আভ্যন্তরীণ অনেক অসুবিধাই কাটিয়া গিয়োছে বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমান সরকার অরাজনৈতিক নির্দলীয় হইলেও এই পথযাত্রায় গোটা জাতিকেই পরিচয় দিতে হইবে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার। দেশের শাসন ব্যবস্থায় যাহারা রহিয়াছেন এবং থাকিবেন, তাহাদিগকে পরিচয় দিতে হইবে রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টির, বিচারকসুলভ ন্যায়পরায়ণতার এবং গণমুখী ভূমিকার। বলা বাহুল্য, শাসক ও শাসিতের সরকার ও জনগণের এই উভয়বিধ ভূমিকাই জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার দাবিদার। এই পর্যায়ে, দেশের শাসকমণ্ডলির মধ্যে যে ঐক্য, যে সমঝোতা এবং যে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, জাতীয় জীবনে উহার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটাইতে হইবে। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি জোয়ানকে স্ব-স্ব কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমদও বিপ্লবের ফলে সমুদ্ভাসিত জাতীয় সত্তার মহিমাকে কর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ, সংগঠিত এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করার আহ্বান জানাইয়াছেন। আর প্রেসিডেন্ট সায়েম বলিয়াছেন, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সর্বশ্রেণীর জনগণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমরা আনন্দিত যে, আমাদের জোয়ান ভাইয়েরা সেনাবাহিনীপ্রধানের আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমরা আশান্বিত যে, নব বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শেণী স্ব-স্ব কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং আদর্শনিষ্ঠ ও অধিকার-সচেতন জনগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে নব উদ্দীপনার সহিত কাজকর্ম করিয়া চলিয়াছেন।

এ-কথা সত্য যে, দেশের সাধারণ মানুষের মত আমাদের সেনা, বিডিআর, পুলিশবাহিনীর নানা রকম সমস্যা রহিয়াছে। রহিয়াছে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবস্থার ও অন্যবিধ সমস্যা। আমরা আশা করিব, সরকার সীমিত সাধ্যের মধ্যেও সহানুভূতির সহিত উহা সমাধানের চেষ্টা করিবে।

আমরা আগেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, ইতিহাস বারে বারেই জাতিকে সঙ্কট সন্ধিক্ষণে নিপতিত করিয়াছে। বারে বারেই এ জাতি নব

www.pathagar.com

উদ্দীপনায় নব প্রাণ সঞ্জীবনী ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এবারেও প্রমাণিত হইয়াছে, উদ্বুদ্ধ এই প্রাণশক্তিকে অবদমিত করার সাধ্য কাহারও নাই। তাই স্বার্থান্বেষী চক্রের সকল পাঁয়তারা নস্যাৎ করিয়া জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বার্থে সর্বস্তরে রক্ষা করিতে হইবে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং একতা।

দৈনিক ইত্তেফাক

(সোমবার, ২৩ কার্তিক, ১৩৮২)

'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' ...

বনের পাখির দুঃখ খাঁচার পাখি বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু বনের পাখির মুক্ত জীবনের আনন্দ খাঁচার পাখির বুঝার আওতার বাহিরে। কথাটা 'রিটোরিক' বা নিছক আবেগ-উচ্ছ্বাসপ্রসূত বলিয়া বোধ হইতে পারে, তবু স্বীকার করিতে হয়, জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই আবেগ-উচ্ছ্বাসটুকুই পরম সত্য। দেশের যে কোন জাতির সবচাইতে বাঞ্ছিত ধন যাহা তাহা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বাঙালি কবির প্রশ্ন ছিল, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? ইতিহাস ঘাঁটিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলে দেখিতে পাই, যাহারা আত্মসম্ভ্রমহীন, যাহাদের মনুষ্যত্ববোধের অভাব, শুধু তাহারাই স্বাধীনতা হেন পরম ধনের মূল্য দেয় না। তাহারা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ ঘটিয়াছে ইতিহাসের উপেক্ষা, ঘৃণা ও স্মৃতিতে।

অপরপক্ষে যাহারা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, সাতপুরুষে বহমান জীবনধারা, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা যাহাদের জীবনবোধ, মমত্ববোধ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের অংশ, তাহারা জাতি হিসেবে ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ের অধিকারী। শত বাধা-বিপত্তি, হাজার প্রতিকূলতা ও অন্তরায়ের মধ্যেও যাহারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ রক্ত-ধমনীর প্রবাহে অনুভব করিয়াছেন, পবিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির জন্য অকুণ্ঠচিত্তে সবকিছু বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাদের কেহ বা কোন কিছুই পরাজিত করিতে পারে নাই। না কোন বহিঃশত্রু, না কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। যে কোন দেশ, যে কোন জাতি একটি অনন্য সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া এক ও অভিন্ন কণ্ঠ সোচ্চার করিয়া তুলিতে পারে এবং সেই সূত্রটির নাম জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

বাংলাদেশ হয়ত দরিদ্র দেশ। উন্নয়নশীল দেশ। শতাব্দীর নানা শোষণ ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় বহুবিধ সমস্যা এখানে জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এই জাতি কখনও আপস করিতে শিখে নাই। এই দেশের গহীন নদী, নীল বিস্তৃত আকাশ, বৈচিত্র্যময় নিসর্গের মতই স্বাধীনতা এই জাতির প্রিয় উচ্চারণ, বহু বাঞ্ছিত প্রাণের ধন। বার বার হায়েনারা এই দেশের উপর লোভ-লালসার চকচকে সবুজ চোখ রাখিয়াছে। এই জাতি কখনও হায়েনাদের বিরুদ্ধে একমন একপ্রাণ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে নাই। এই জাতির

www.pathagar.com

বহমান ইতিহাসের ধারায় সাময়িক ব্যর্থতা হয়ত আছে, দুনিয়ার কোন জাতির ইতিহাসেই-বা তাহা নাই, দুঃখ-দুর্ভোগের চিহ্নও হয়ত আছে, কিন্তু নাই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিচ্যুতিজনিত গ্লানি বা অপমানের কালিমা।

জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে দেশ-প্রাণ জাতি সকল সময়ই নিজেদের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ, স্বার্থচিন্তা, আত্মকলহ ও পারস্পরিক হানাহানি ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, পর্বতের ন্যায় অটল ও বজ্রের ন্যায় তীব্র কঠোর হইয়াছে। ইহা জাতি হিসেবে আমাদের গর্বের বিষয়।

গত ৭ নভেম্বর সুপ্রভাতে সৈনিক-জনতার বিশাল-ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে যে বক্তব্যটি পুনরায় কম্বুনাদে মুখরিত হইয়াছে, তাহা আর কিছু নহে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বেগ-বিস্তারি ঘোষণা। যে কোন বাধা আসুক, যে কোন প্রতিকূলতা দেখা দিক, হায়েনার নখরে যত শক্তিই থাকুক, জাগ্রত জনতা সেই সবের পরোয়া করে না, ইহাই ৭ নভেম্বরের জন্য অভ্যুত্থানের বক্তব্য।

দেশে বর্তমানে বিরাজমান সামরিক বিভ্রান্তি ইত্যাদি হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী কোন শক্তি বা মহল যদি মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাইয়া ইহার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করার ইহাই মোক্ষম সময়— আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাহাদের জানাইয়া দিতে চাই যে, তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে কারণ, বাঙালিরা শুধু স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিতেই জানে না, উহাকে রক্ষা করিতেও জানে।

www.pathagar.com

সংবাদ (ঢাকা শনিবার, ২১ কার্তিক, ১৩৮২)

মুক্তি সংগ্রামের অগ্রনায়কের অগ্রণী ভূমিকা

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর অগ্রনায়ক জিয়াউর রহমান জাতির এক সঙ্কট সময়ে এগিয়ে এসেছেন। অনিশ্চয়তা ও দিশেহারা জাতির জীবনের সঠিক পথনির্দেশের সুস্থ ও সুস্পষ্ট কর্মধারার ভিত্তি রচনার কঠিন ও মহান দায়িত্ব পালনে তার সময়োচিত প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা জাতিকে সঙ্কট উত্তরণের পথনির্দেশ দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসারসহ সকলের অনুরোধে পূর্বাহ্নে মেজর জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও চীফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্বভার সাময়িকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সঙ্কট মুহূর্তে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সাথে প্রশাসন কাঠামোতে স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভূমিকা ও অবদান পালনে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধান্বিত ছিলেন না। জনতার ভালবাসায় ও অভিনন্দনে সিক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক সেনানী হিসেবে তিনি মুহূর্তের জন্যও ক্ষমতাগর্বে আত্মহারা হন নি। বাংলাদেশের মানুষের মনে মেজর জেনারেল জিয়ার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত।

'৭১-এর ২৫ মার্চে জাতি হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ার পর ২৬ মার্চের প্রভাতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে জাতির অন্তরে সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছিল। অকুতোভয় সেনানী সেদিনই সর্বপ্রথম উদাত্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশের মানুষ বাংলার দেশপ্রেমিক বীর সৈনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় মুক্তি অর্জন করেছে। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়ার সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামী ভূমিকা চির অম্লান হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘোষিত পদক্ষেপ থেকে আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণসাধনে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্তই জনগণকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে। গতকাল বেতারে জাতির উদ্দেশে খন্দকার মোস্তাক আহমদের ভাষণ দেশে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক সুস্থ পরিবেশের পটভূমি রচনা করেছে। পুনরায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরে যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা এ দেশের মানুষের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। বাংলাদেশের অশান্তিক্লিষ্ট মানুষের কাছে শান্তিই আজ সবচেয়ে বেশি কাম্য। এই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ সকল মেহনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য পর্যায়ের মানুষের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার।

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলা

(৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

শুক্রবার এক ঐতিহাসিক, অভূতপূর্ব বিপ্লব সূচিত হল জাতির জীবনে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর নায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অপার সাফল্যে জয়যুক্ত সিপাহী-জনতার মিলিত এই বিপ্লব। সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণের ইচ্ছায় সেনাবাহিনীপ্রধানের দায়িত্বের সাথে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল জিয়া। দেশের সাধারণ মানুষের সাথে ঐতিহাসিক এই বিপ্লবী অভিযাত্রীর শরিক সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং আনসার বাহিনী। সিপাহী এবং জনতার এমন অভেদ্য, নিশ্চিদ্র ঐক্য তুলনাহীন। মুক্তি সংগ্রামকালীন দিনের এই দুর্লভ মুহূর্তগুলোর সাথেই শুধু এর তুলনা চলে।

রাজধানী ঢাকার রাজপথে শুক্রবারের প্রথম কাকডাকা ভোরে প্রত্যক্ষ করেছে অনন্য, অতুলনীয় এক দৃষ্টান্ত। রাস্তায় রাস্তায় স্বর্তঃস্ফূর্ত গণমিছিল, সিপাহীদের সাথে জনতার মিলিত উল্লাস, জয়ধ্বনির উল্লাস, আনন্দের কলকল্লোল। কণ্ঠে উচ্চারিত নিনাদ: বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। অভিন্ন একটি অনুভূতিতে উদ্বেলিত সমগ্র রাজধানী নগরী গোটা দেশ। প্রাণের সাথে প্রাণের স্পর্শে একাত্ম হয়েছে সৈনিক এবং জনগণ। যে ঐক্য আকীর্ণ হয়েছিল এত দিন সংশয়ে তাকে আবার অনিবাশী সত্যে প্রতিষ্ঠিত করল সেই জাগ্রত চেতনা, যার নাম স্বাধীনতা। যার নাম দেশপ্রেম।

জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তির এই নব উত্থান, তার বৈপ্লবিক সত্তার এই উদ্ভাবন আবার প্রমাণ করল, বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে খর্বিত করার সাধ্য নেই কোন চক্রান্তের, দেশী-বিদেশী কোন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবুদ্ধির। কারও ক্ষমতা নেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে আঘাত করার, দুর্বল করার।

৬ নভেম্বরের মধ্যরাত্রির ঘন তমসা ভেদ করে দেশপ্রেমিক সৈনিকদের অকুতোভয় অভিযাত্রা নিষ্কম্প এই প্রত্যয়ের অবিচল এই অঙ্গীকারের ঘোষণাই রেখে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী এই জাতির সামনে। ঘোষণা করেছে তাবৎ বিশ্ববাসীর কাছে। যে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিভ্রান্তির কয়েকটি ঘণ্টা অতিক্রম করছিল দেশবাসী বিনিদ্র একটি রাত জেগে তার অবসান কামনায় প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুখ উৎকর্ণ হয়েছিল তারা।

সেই প্রতীক্ষার শেষ হল প্রভাতের আলোর বিচ্ছুরণের আকস্মিক অন্ধকারের ঘোর কেটে যাবার সাথে সাথে। রাজপথে তখন স্বাধীনতার অতন্দ্র সিপাহীদের বিজয় পদধ্বনি।

সেই বিজয়কে নন্দিত করার জন্য মুহূর্তে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল অগণিত নর-নারী। রাজপথ হল উদ্বেলিত একটি জনসমুদ্র, সারা শহর ক্ষান্তহীন

www.pathagar.com

মিছিলনগরী। বিজয় তোপধ্বনির সাথে প্রভাতের বাতাসে সাড়া জাগালো জনতার উল্লাসধ্বনি।

অজস্র কণ্ঠের কল্লোলে, প্রত্যাশায়, সচকিত নিনাদে ছিন্ন ভিন্ন হল সেই তমসা— যা হঠাৎ জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এক আশাহত বিমূঢ়তায়। শুক্রবারের নির্মেঘ আকাশ এবং নতুন সূর্যরশ্মি খচিত উজ্জ্বল প্রভাব আবার ছিনিয়ে আনল জাতির পরাভবহীন বিশ্বাসকে। ছিনিয়ে আনল তার অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং আত্মসচেতনতার সূতীক্ষ্ণবোধকে।

বিভেদ এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি আজ পরাভূত। সংশয় এবং আচ্ছন্নতার কুটিল মেঘ আলোকিত আকাশ থেকে নিষ্ক্রান্ত। তা হলেও আত্মতুষ্ট হলে চলবে না কাউকেই। অতীতের ভ্রান্তির সর্বনাশা পরিণাম থেকে নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে।

নতুন শপথ নিতে হবে ঐক্যের এই প্রেরণাকে নিয়ত জাগ্রত রাখতে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিভেদের শক্তি কোনো দুর্বলতার ছিদ্রপথে আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। অসামান্য দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে এই মুহূর্তে প্রতিটি দেশপ্রেমিককে, প্রতিটি নর-নারীকে এবং গোটা জাতিকে।

সুখী-সমৃদ্ধ এবং সুস্থ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের সংগ্রামের চিহ্নিত লক্ষ্য। অবিচল আস্থা নিয়ে সেই লক্ষ্যের পথে আমাদের পা বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই জাতির অজেয় শক্তির উৎস হল তার অচ্ছেদ্য জাতীয় ঐক্য এবং দেশপ্রেম। তার রক্ষাকবচ হল স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব।

সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব, তাদের মিলিত কণ্ঠের বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি এই বিশ্বাসকেই আজ সবকিছুর উপর বড় করে তুলে ধরেছে। এই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষাই আমাদের সকলের, দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণের সুমহান দায়িত্ব।

বাংলাদেশ চিরঞ্জীব, তার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সকল অভিঘাতের ঊর্ধ্বে। অনাগত যুগে যুগে ধ্রুব এই সত্য থেকেই অনুপ্রাণিত এবং বলীয়ান হবে বাঙালি জাতি। সৈনিক-জনতার ঐক্য অমোঘ হোক। অমর হোক।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর :
ইতিহাস কথা কয় : সংবাদপত্রের প্রতিবেদন
উল্লাসমুখর দেশ, উদ্বেল রাজধানী

দৈনিক ইত্তেফাক

বিশেষ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫

প্রাণবন্যায় উচ্ছল নগরী

পথে পথে আজ জনতার কলরোল, পথে পথে আজ বিজয়ের আনন্দ। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘনঘোর আমানিশার অবসান ঘোষণা করিয়া হেমন্তের প্রভাত সূর্যের আগমনের সাথে সাথে পথে নামিয়াছে আনন্দোচ্ছল অজস্র মানুষের ঢল। মানুষের নিকট স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব কতখানি প্রিয়তম সম্পদ তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে আজ। ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ আর জয়ধ্বনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসধ্বনির সহিত একত্রিত হইয়াছে।

রাত্রি হইতে একটানা গোলাগুলির শব্দে রাজধানীর মানুষগুলি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় প্রহর গুনিতেছিল— অকস্মাৎ সেনাবাহিনীর শ্লোগান আর অভয়বাণী তাহাদের সমস্ত জড়তাকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। সেই ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের মত একইভাবে একই উল্লসিত প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত হইয়াছে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের প্রত্যুষ। ভোর হইতে রাস্তায় রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ নামিয়াছে, মিছিল করিয়াছে— জিয়া ও মোশতাকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছে। ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই হর্ষোৎফুল্ল সৈনিক-জনতা জিয়া ও মোস্তাকের ছবি লইয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক। গাড়িতে করিয়া সেনাবাহিনী প্রত্যেকটি মহল্লায় গিয়া জনগণকে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ জানাইয়াছে, দেশের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়াছে— কামনা করিয়াছে জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা।

সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, তথা সমস্ত আইন প্রয়োগ সংস্থার সহিত জনগণের জনগণের আন্দোলণ প্রাণের স্পন্দন একই লয়ে স্পন্দিত হইয়াছে।

প্রাণবন্যায় উচ্ছল নগরী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

তখনও আকাশে অন্ধকার ছিল। গোলাগুলির শব্দে প্রকম্পিত শেষ রজনীর ঢাকা। শ্বাসরুদ্ধকর। মুহূর্তগুলি ছিল যুগের মত। বিনিদ্র রাত্রিতে আতঙ্কিত নগরবাসী হয়ত ভাবিতেছিল, '৭১-এর সেই পাষাণ ঢাকা দিনগুলির কথা। এমনি

www.pathagar.com

সময়ে রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রের ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল শ্লোগান— 'সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ' উৎকণ্ঠ নগরবাসীর শ্রবণেন্দ্রিয়। এই অসময়ে রেডিও কি বার্তা শুনাইবে? ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হইল: 'সিপাহী বিপ্লব সফল হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।'

ভোরের আলো উঠিবার আগেই জনতা নামিল রাস্তায়। প্রচণ্ড গুলির মুখেও নিঃশঙ্ক দুঃসাহসী পদবিক্ষেপে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর গাড়ি আর ট্যাঙ্কের ঘরঘর শব্দ। ইহার পর মিছিল, মিছিল আর মিছিল। সিপাহীদের প্রতি উৎফুল্ল অভিনন্দন বা হৃদয় নিংড়ানো আলিঙ্গন। সেনাবাহিনী পরিণত হইল জনগণের সেনাবাহিনীতে। পথে পথে জনতার কলরোল আর সিপাহী-জনতার সম্মিলিত শ্লোগানের ধ্বনির মাধ্যমে যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সেই ফেলিয়া আসা স্মৃতিবিজড়িত দিনটির।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকাল মুখরিত হইল জনতার জয়নিনাদে। সামরিক বাহিনীর গাড়িতেই নহে, বাস-ট্রাকে সেই একই দৃশ্য। খন্দকার মোস্তাক আহমদ আর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহামানের ছবি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ঢল।

গাড়িতে করিয়া সেনাবাহিনী প্রতিটি মহল্লায় গিয়া জনগণকে আদব ও শৃঙ্খলা রাখিবার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাইয়াছেন। দেশের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়াছেন— কামনা করিয়াছেন জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। সিপাহীদের সহিত জনতার আনন্দোচ্ছল প্রাণের স্পন্দন একই লয়ে স্পন্দিত হইয়াছে গতকাল।

নারায়ণগঞ্জে বিজয়োল্লাস

গতকাল সকালে সশস্ত্র বাহিনীর জোয়ানরা বিভিন্ন যানবাহনে করিয়া নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলে শহরের হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতা রাস্তায় নামিয়া আসে এবং সিপাহী-জনতা এক হইয়া শ্লোগানে শ্লোগানে শহর মুখরিত কারিয়া তোলে। নারায়ণগঞ্জ বাসযাত্রীসহ টার্মিনালের লঞ্চযাত্রীরাও বিভিন্ন ধ্বনি দিয়া বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিতে থাকে *(ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)*।

www.pathagar.com

সংবাদ

৮ নভেম্বর, ১৯৭৫

রাজধানীর পথে পথে লাখো জনতার আনন্দ মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাজধানীতে ঢাকা গতকাল শুক্রবার ছিল বিজয় উল্লাসের আনন্দে উদ্বেল এক উৎসবমুখর নগরী। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ২টায় রেডিও বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত রাজপথে নেমে আসে করতালি আর শ্লোগানে মুখর স্বতঃস্ফূর্ত লাখো জনতার ঢল আর আনন্দ মিছিল।

সে এক অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য। শহরের পথে পথে অলিগলিতে ফুল, মালা আর হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য দিয়ে জনসাধারণ বরণ করে নেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিরাপত্তা রক্ষাকারী অকুতোভয় সেনাবাহিনীর সিপাহীদের। আগের দিন গভীর রাত থেকে গতকাল প্রায় সারা দিন ধরে সেনাবাহিনী আর জনতা একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে হাতে হাত রেখে সারা শহরকে প্রকম্পিত করে রাখে গগণবিদারী শ্লোগানে। সিপাহী আর জনতার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে- বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, মোস্তাক আহমদ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই ইত্যাদি।

শুধু মিছিল আর মিছিল। ট্যাঙ্কের মিছিল। বাস, ট্রাক, জীপ, রিকশার মিছিল। পায়ে হাঁটা জনতার মিছিল। এ মিছিল সেনাবাহিনী আর জনতার মিলিত মিছিল, আবালবৃদ্ধবনিতার মিছিল। পাশাপাশি আনন্দ করতালি, কাওয়ালী, গান, ব্যান্ড পার্টি আর নৃত্যে মুখর সিপাহী-জনতার গাড়ি আর মিছিল ঘুরেছে সারা শহরে। মুহূর্তে মুহূর্তে সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা তাদের স্টেনগান-রাইফেল থেকে উৎসবের আনন্দে গুলি ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করেছেন আর রাস্তার ধারে বাড়ির দরজা, জানালায়, ছাদে দাঁড়ানো জনতাকে আরো উল্লসিত করে তুলেছেন। যে পথ দিয়ে সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীরা অতিক্রম করেছেন আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাদের ফুলের মালা দিয়ে আর হাত তুলে জানিয়েছে আন্তরিক অভিনন্দন। সূর্য সারথী সেনাবাহনীর ভাইয়েরা শুধু গাড়িতে চেপেই শহরে ঘোরেন নি, তারা কলোনিতে, পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে ঈদের আনন্দে জনগণের সাথে আলিঙ্গন করেছেন, হাত মিলিয়েছেন। এ সময় তাদের মুখে কেউ তুলে দিয়েছেন মিষ্টি, করেছেন— আদর আর আপ্যায়ন। '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে ঢাকার রাজপথে জনতা-সেনাবাহিনীর মিলনের এমন তুলনাবিহীন দৃষ্টান্ত আর অযুত জনতার আনন্দমুখর মিছিল দেখা যায় নি।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অফিস-আদালতের কর্মচারি, শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ব্যাবসায়ীসহ সমাজের সর্বস্তরের জবনগণের পক্ষ থেকেই গতকাল ঢাকা শহরে আনন্দ আর মিছিল বের করা হয়। আমাদের নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গতকাল সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীরা শহরে প্রবেশের সাথে সাথে শহরের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, নর-নারী সর্বস্তরের মানুষ তাদের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে ও সিপাহীদের অভিনন্দন জানায়। এরপর জনসাধারণ সিপাহীদের গাড়িতে ওঠে এক সাথে শহর পরিক্রমণ করে আর বিভিন্ন আনন্দ ধ্বনি প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলা

টেলিগ্রাম, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫

উল্লাসে উদ্বেল ঢাকা নগরী

(স্টাফ রিপোর্টার)

রায়ের বাজার-নিউমার্কেট এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন: রায়ের বাজার, জিগাতলা, ধানমণ্ডি, নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, শাহবাগ সেই কাকডাকা ভোর থেকেই এই সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ঘর আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারে নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বেরিয়ে এসেছে ছাত্র-যুবক-বৃদ্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এমনকি মহিলারাও বেরিয়ে এসেছেন কোথাও কোথাও।

পথে পথে সে আর এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী-জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে-ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলা গাড়ি, হাফট্রাক জীপ। ছুটে চলছে ট্যাঙ্ক। সহস্র বিপ্লবী সিপাহীর সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে বিপ্লবী জনতা। কণ্ঠে তাদের শ্লোগান—বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। আর সেই সাথে সাথে প্রাণের উন্মাদনায় আকাশমুখী ফুটিয়ে চলেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের গুলি। সারা শহরে শুধু গুলির আওয়াজ। আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া প্রাণের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের আওয়াজ। এ যেন সেই '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের দৃশ্য।

জনতা-সেনাবাহিনী মিলনের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত। শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়িতে নয়, বেসামরিক যানবাহনেও উঠেছে সেই উল্লাস, একই শ্লোগান। এখানেও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সিপাহীরা।

মেজর জেনারেল জিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনে আনন্দে উদ্বেলিত ঢাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করেছে মিছিল। ট্রাকে ট্রাকে উল্লসিত জনতার গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ৭ নভেম্বরের সকাল।

মেজর জেনারেল জিয়ার কণ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগময় দিনে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বাংলার মানুষকে, ঠিক তেমনিভাবে যেন আবারও সৃষ্টি করেছে উন্মাদনার জোয়ার।

এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত শহরের পথে পথে চলেছে উল্লসিত জনতার আনন্দ মিছিল। জনতা জোয়ারে প্রাণ জেগেছে সেই কাকডাকা ভোর থেকে তা অব্যাহত রয়েছে। এগিয়ে চলেছে বিপুল গতিতে।

মতিঝিল ও হাটখোলা থেকে লিখেছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার: কাকডাকা ভোর। দূরে বহু দূরে শ্লোগানের ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। এ ঘোষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আনন্দের উচ্ছাস। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল খণ্ড খণ্ড মিছিল। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা লরি, ট্রাক ও বাসে করে মতিঝিলের রাস্তা ধরে যাচ্ছেন।

এযেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এ ঘটনা বিরল। শুধু স্মৃতিপটেই ধরে রাখা যায় তা। মহিলারাও বাড়ির ছাদে উঠে দেখছিলেন সে দৃশ্য। শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান। রাতে ঝিমিয়ে পড়া মতিঝিলের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোতেও যেন নতুন দিনের হাতছানি। ভোরের আকাশে উঁকি দিচ্ছে রক্তিম লাল সূর্য।

জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার বিপ্লব

টেলিগ্রাম, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫

(স্টাফ রিপোর্টার)

সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লবে ৪ দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

মিছিল আর মিছিল। বিপ্লবের বিজয়ের, উল্লাসের মিছিল। শ্লোগান আর শ্লোগান। করতালি আর করতালিতে প্রাণের দুন্দুভি। আকাশে উৎক্ষিপ্ত লাখো হাত একের পর এক হচ্ছে প্রত্যয়ের স্বর্ণঈগল। পথে পথে সিপাহী আর জনতা আলিঙ্গন করছে, হাত নেড়ে জানাচ্ছে অভিবাদন— কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত, এক কণ্ঠে একই আওয়াজ— সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জোয়ান জোয়ান ভাই ভাই ; বাংলাদেশ— জিন্দাবাদ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান— জিন্দাবাদ, খন্দকার মোস্তাক— জিন্দাবাদ, আমাদের আজাদী— রাখবই রাখব, স্বাধীনতা স্বাধীনতা— রাখবই রাখবই, হাতের সাথে হাত মিলাও— এক কাতারে শামিল হও। এত আনন্দ, এত উল্লাস সিপাহী ও জনতার হৃদয়ের কোরাস, শ্লোগানের সাথে কামানের এমন অর্কেস্ট্রা— এ এক অনন্য ইতিহাস। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার— এই ৪ দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর পেরিয়ে এসেছে শুক্রবারের সোবেহ সাদেক, সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লব এনেছে শুক্রবারের বিজয়ের সূর্য। ঢাকা উল্লাসে টালমাটাল,বাংলাদেশ আনন্দে উদ্বেল। এই রিপোর্ট আমরা যখন লিখছি তখনও পথে পথে একের পর এক বিজয় মিছিল যাচ্ছে ট্রাকে চেপে, পায়ে হেঁটে, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস্, পুলিশ, আনসার ও দমকল বাহিনীর একেকটি দল যাচ্ছে— করছে রাজধানীর পথ পরিক্রমা।

তাদের সাথে এক ট্রাক সারিতে রয়েছে নানাস্তরের জনগণও। পথে পথে ঘুরছে ট্যাঙ্ক আর আর্মড কার। পেছনে পেছনে জনতা। কোন কোন ট্যাঙ্ক ও আর্মড কারেও জনতা উঠে বসেছে, শ্লোগানে শ্লোগানে-আনন্দে প্রাণের ঢল। ঢাকা নগরে তখন ছড়িয়ে গেছে বিজয়ের বার্তা। পথের পাশে মোড়ে মোড়ে জনতা। সিপাহীরা ট্রাকের পর ট্রাকে, লরির পর লরিতে যাচ্ছে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলে যাচ্ছে জয়ের কথা— পথের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য রাখছে শ্লোগান দিচ্ছে আর তারপর সাথে সাথে শ্লোগান জনগণের। বহু মহিলা এসে রাস্তার

www.pathagar.com

পাশে এখানে সেখানে জড়ো হয়েছে। স্কুলড্রেস পরা ছেলেমেয়েরা এখানে সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেখানে লোকজন আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছে। কোথাও কোথাও সড়ক নিক্ষিপ্ত সিপাহীদের গুলিতে আনন্দে উল্লাসে উদ্বেল নগরী। শুরু অনেক আগে থেকেই— বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত প্রায় দুটো-আড়াইটা থেকে ঢাকার জনগণ যখন বুঝতে পারলেন দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়ে আসছে— শুরু হয়েছে সিপাহী বিপ্লব, তখন থেকেই তারা রাজপথে নামতে শুরু করলেন।

এক পর্যায়ে দেখা গেল, ময়মনসিংহ রোডে হাজার হাজার লোক, নানা স্তরের, নানা বয়সী। সিপাহীরা তাদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলছেন। শ্লোগান দিতে দিতে জনতা এগুচ্ছে ফার্মগেটের দিকে, রেডিও ট্রানজিস্টারের পাশে জনতা উৎকর্ণ— মেজর জেনারেল জিয়া কখন ভাষণ দিবেন। ভোর হল। পথে পথে তখন জনতার জোয়ার। দ্বীপে পথচারীরা মিলিত হয়েছেন মিলাদ মাহ্‌ফিলে।

আনন্দ উদ্বেল মানুষের ঢল নেমেছিল

দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫

(স্টাফ রিপোর্টার)

আনন্দ উদ্বেল মানুষের এক অভূতপূর্ব জোয়ার নেমেছিল গতকালের ঢাকায়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লবে এবং বেতারে জিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছিল পথে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে যে সিপাহী বিপ্লবের শুরু তার সার্থক পরিণতি সর্বস্তরের জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে বিপ্লবের সাফল্যের বার্তা নিয়ে সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছিল যে হাজার হাজার বীর সেনা তাদের হাতে হাত মিলিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ ঘোষণা করেছে সর্বাত্মক একাগ্রতা। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তুলেছে বিপ্লবের সপক্ষে। এ উল্লাসের শুরু সেই ভোর থেকে। চলেছে সারা দিন। বেলা ২টার দিকে জেনারেল জিয়ার আহ্‌বানে সিপাহীরা ছাউনিতে ফিরে যাবার পরও জনতার এ উল্লাস চলতেই থাকে। অসংখ্য মিছিল আর সভার মধ্যদিয়ে জনতা এই বিপ্লবের প্রতি জানায় আন্তরিক অভিনন্দন।

গতকালের ঢাকা নগরী সম্পর্কে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টাররা লিখেছেন:

রায়ের বাজার, জিগাতলা, ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, শাহবাগ— সেই কাকডাকা ভোর থেকেই এ সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ঘর আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারেনি।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বেরিয়ে এসেছে ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এমনকি মহিলারাও বেরিয়ে এসেছেন কোথাও

www.pathagar.com

কোথাও। পথে পথে সে আর এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী-জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে-ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলা গাড়ি, হাফট্রাক জীপ। ছুটে চলছে ট্যাঙ্ক। সহস্র বিপ্লবী সিপাহীর সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে বিপ্লবী জনতা। কণ্ঠে তাদের স্লোগান— বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা— ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া— জিন্দাবাদ। আর সেই সাথে সাথে প্রাণের উন্মাদনায় আকাশমুখী ফুটিয়ে চলেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের গুলি। সারা শহরে শুধু গুলির আওয়াজ। আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া প্রাণের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের আওয়াজ। এ যেন সেই '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের দৃশ্য।

জনতা-সেনাবাহিনী মিলনের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত। শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়িতে নয়, বেসামরিক যানবাহনেও উঠেছে সেই উল্লাস, একই শ্লোগান। এখানেও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সিপাহীরা।

মেজর জেনারেল জিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনে আনন্দে উদ্বেলিত ঢাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করেছে মিছিল। ট্রাকে ট্রাকে উল্লসিত জনতার গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ৭ নভেম্বরের সকাল।

মেজর জেনারেল জিয়ার কণ্ঠস্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগময় দিনে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বাংলার মানুষকে, ঠিক তেমনিভাবে যেন আবারও সৃষ্টি করেছে উন্মাদনার জোয়ার।

মতিঝিল ও হাটখোলা থেকে লিখেছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার: কাকডাকা ভোর। দূরে বহু দূরে শ্লোগানের ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। এ ঘোষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আনন্দের উচ্ছাস। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল খণ্ড খণ্ড মিছিল। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা লরি, ট্রাক ও বাসে করে মতিঝিলের রাস্তা ধরে যাচ্ছেন।

এ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এ ঘটনা বিরল। শুধু স্মৃতিপটেই ধরে রাখা যায় তা। মহিলারাও বাড়ির ছাদে উঠে দেখছিলেন সে দৃশ্য।

শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান। রাতে ঝিমিয়ে পড়া মতিঝিলের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোতেও যেন নতুন দিনের হাতছানি। ভোরের আকাশে উঁকি দিচ্ছে রক্তিম লাল সূর্য।

বিভিন্ন বয়সী লোক শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর করে তুললেন আকাশ-বাতাস। তাদের কণ্ঠে তখন বজ্রধ্বনি— জনতা-সিপাহী ভাই ভাই। জেলের তালা ভেঙ্গেছি, জেনারেল জিয়াকে এনেছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিপাত যাক। জনতা দুই হাত তুলে বিপ্লবী অভিবাদন জানাল তাদের প্রিয় সৈনিক ভাইদের।

www.pathagar.com

ইস্কাটন এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার: রাত ২টা থেকে দু-একজন করে লোক জমতে শুরু করে রাস্তার মোড়ে। রাত ৩টায় জনতায় ভরে উঠতে শুরু করে। আনন্দে উদ্বেল জোয়ানদের সাথে একাত্ম হয়ে যায় জনতা। শ্লোগান ওঠে বাংলাদেশ— জিন্দাবাদ। সিপাহী বিপ্লব— জিন্দাবাদ। সিপাহী-জনতা— ভাই ভাই। জেনারেল জিয়া— জিন্দাবাদ। জনতার আনন্দ চিৎকার আর ফাঁকা গুলির আওয়াজ একাকার হয়ে যায়।

ফার্মগেট, তেজতুরী বাজার, হাতিরপুল, সেন্ট্রাল রোড সর্বত্র সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সাথে মিশে যায়।

ভোরে রেডিওতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বীর নায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে চীফ মার্শাল'ল এডমিনিস্ট্রেটর এবং সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণের খবর শোনার পর মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি এলাকার জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে মেতে ওঠে। পূর্বের আকাশ ফর্সা হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ী বীর সৈনিকরা বাস ও ট্রাকে করে মিছিলে বের হলে মুক্তিপাগল মানুষও ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে তাদের সাথে যোগ দেন। মিছিলকারী সিপাহীদের জনগণ মুহুর্মুহু করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করেন। বাড়ির মেয়েরা আঙিনায়, বাড়ির ছাদে ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে বীর জোয়ানদের বিজয় মিছিলকে হাত তুলে অভিনন্দন জানান। তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সূর্য ওঠার সাথে সাথে রাস্তা মুক্তিপাগল মানুষের মিছিলে ছেয়ে যায়। সিপাহীদের সাথে একই বাস ও ট্রাকে করে মিছিলে যোগ দেন। তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি দেন। বাংলাদেশ— জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা— ভাই ভাই, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান— জিন্দাবাদ। বীর সিপাহীদের হাতের রাইফেল, মেশিনগানগুলো মুহুর্মুহু গর্জে ওঠে অধিকারবঞ্চিত মানুষের বিজয় বারতা ঘোষণা করে। এই অস্ত্রশস্ত্রের গর্জন কাউকে ভীত করে নি, যেন বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাস্তিলের কারাদুর্গ ভেদ করে শৃঙ্খলিত মানুষ যেন শাশ্বত মুক্তির স্বাদ লাভ করেছে।

মুক্তিকামী মানুষের পক্ষ থেকে যেন স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচারের জগদ্দল পাথর নেমে গেছে। সিপাহীদের এই মিছিলে ছিল সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, রাইফেল বাহিনী, পুলিশ এবং আনসার। তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছেন আনন্দউল্লসিত মানুষ। শুক্রবার ভোর থেকেই মোহাম্মদপুর, ধানমণ্ডি এলাকায় চলে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত উচ্ছল জনতার বিজয় মিছিল। এখন স্বাধীনতার মহোৎসব। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন পরম সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে। মিছিলে ট্যাঙ্কও চলেছে। মুক্তিপাগল জনতা ও সিপাহীদের সশস্ত্র মিছিল চলার সময় কোথাও স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়নি। মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ বঞ্চিত মানুষের বিজয় ঘোষণা করেছে, বিভীষিকার সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেনি। জনগণ সৈনিকদের সাথে আলিঙ্গন করেছেন। অস্ত্রশস্ত্রকে মনে করেছেন তাদের শাশ্বত মানবিক অধিকার রক্ষার হাতিয়ার। মুক্তিপাগল সৈনিক-জনতার এই আনন্দস্রোত নিউমার্কেট, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, শাহবাগ এলাকায় এসে ঊর্মিমুখর জনতার মহাসমুদ্রে মিলিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ, বাসস'র খবর: সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গতকাল ভোরের দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরে প্রবেশ করলে সর্বস্তরের লোক তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যর্থনা জানান। পথে পথে শুরু হয় আনন্দ মিছিল। রাস্তার পাশে পাশে এবং আশেপাশের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা সিপাহী-জনতার এই মিছিল দেখেন।

নারায়ণগঞ্জে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর লোকজনও সিপাহী-জনতার আনন্দ মিছিলে যোগ দেন।

মানিকগঞ্জে আনন্দ মিছিল

মানিকগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে— এই সংবাদ রেডিওতে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় খণ্ড খণ্ড আনন্দ মিছিল। মিছিলে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়।

আরিচা, মানিকগঞ্জ, ধামরাই, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সাভার থেকে ট্রাকযোগে আনুমানিক ৮ হাজার ছাত্র, যুবক ও সামরিক বাহিনীর বীর জোয়ান দেশাত্মবোধক শ্লোগান দিয়ে ঢাকার দিকে যান।

আনন্দোৎসবে ২৪ জন আহত

(স্টাফ রিপোর্টার) শুক্রবার মিছিলের নগরী ঢাকায় ২৪ ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতাল সুত্রে এ কথা জানা গেছে। এদের মধ্যে কজনের অবস্থা গুরুতর। আনন্দোৎসবে যোগ দিতে গিয়ে বাস ও ট্রাক দুর্ঘটনায়ও ১০ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত কিছু কিছু ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

----

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com